কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস
২৮ এপ্রিল ২০১৭

শোভন কর্মপরিবেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

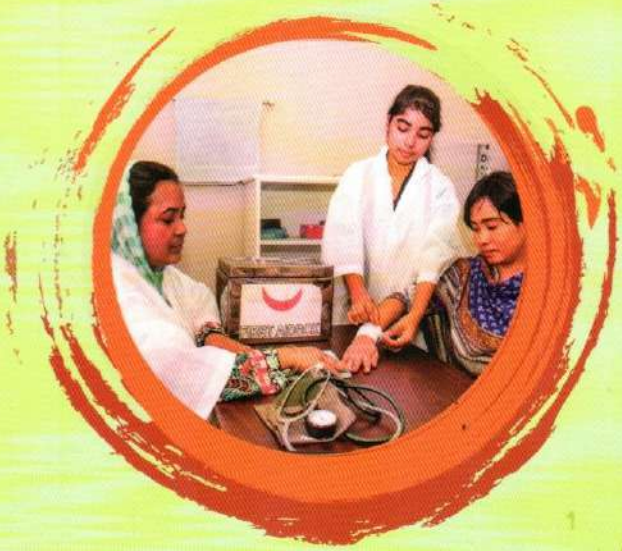

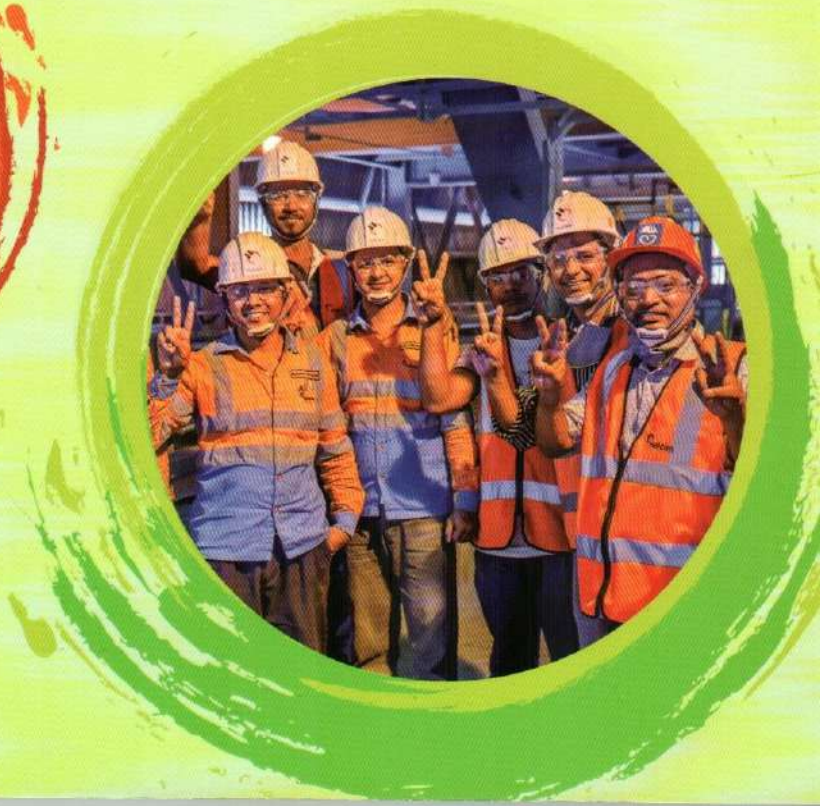

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

রাষ্ট্রপতির বাণী

১৫ বৈশাখ ১৪২৪
২৮ এপ্রিল ২০১৭

নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দেশব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে "শোভন কর্মপরিবেশ, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ"-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দ্বিতীয়বারের মতো 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি মালিক-শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে হালনাগাদ প্রযুক্তি এবং শ্রম সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিতের বিকল্প নেই। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের কর্মস্থলে উন্নত কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকের সুস্থতা ও শোভন কর্মপরিবেশের সাথে উৎপাদনশীলতা নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। সে পরিপ্রেক্ষিতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য যথার্থ বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। জাতির পিতার নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার শ্রমজীবী মানুষের জীবন-মান উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। সরকার শ্রমজীবী মানুষের স্বাস্থ্যসম্মত ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। জাতীয়ভাবে এ দিবস পালনের মাধ্যমে সরকার, মালিক ও শ্রমিকের পারস্পরিক সহযোগিতায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সবার মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি মনে করি।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে হলে শুধু দেশের শিল্প মালিক-শ্রমিকদের মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে বিষয়টিকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। দিবসটি উপলক্ষে আমি সরকার, মালিক ও শ্রমিকসহ সারাবিশ্বে আমাদের উন্নয়ন অংশীজনকে পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৭' এর সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর বাণী

১৫ বৈশাখ ১৪২৪
২৮ এপ্রিল ২০১৭

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৭' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'শোভন কর্মপরিবেশ, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ'- অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণে দিবসটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি ছিলেন শ্রমিকদের অকৃত্রিম বন্ধু। শ্রমিকদের অধিকার এবং কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর পরই তিনি সকল কলকারখানা জাতীয়করণ করেন।

আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর শ্রমজীবী মানুষের জীবন-মান উন্নয়ন, শোভন কর্মপরিবেশ ও কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। নারায়ণগঞ্জ এবং গাজীপুরে শ্রমিকদের জন্য দুটি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শোভন, সুস্থ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩' ও 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে। শ্রমিকদের চিকিৎসা ও সন্তানদের উচ্চশিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিক পরিবারকে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় ও সুসংহত করার জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

শ্রমজীবী মানুষের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে আমি শিল্প-কারখানার মালিক, বিনিয়োগকারী, ব্যবস্থাপক ও উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানাই।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০২১ সালের আগেই আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

আমি 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৭' উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কে দেশব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্বিতীয় বারের মতো "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" পালন করতে যাচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো "শোভন কর্মপরিবেশ, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ"। এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে জেনে খুশি হয়েছি।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "বিশ্ব আজ দুইভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষক, আরেক দিকে শোষিত, আমি শোষিতের পক্ষে"। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্যা কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল শ্রেণীর অবহেলিত নিষ্পেষিত মানুষের নায্য অধিকার ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছেন। দেশকে সুখি-সমৃদ্ধ ডিজিটাল মধ্যম আয়ের দেশ গড়ে তুলতে তিনি বদ্ধপরিকর।

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে টিকে থাকার জন্য বিশ্বমানের পণ্য এবং পণ্য তৈরীর কারখানা আধুনিক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রতিযোগিতার সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের কারখানাগুলোকে আধুনিক ও বিশ্বমানের করা হয়েছে। শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। শ্রমিকরা এখন অত্যাধুনিক, নিরাপদ ও কর্মবান্ধব পরিবেশে কাজ করছে। বাংলাদেশে এখন গ্রীন ফ্যাক্টরি গড়ে উঠছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রীন বিল্ডিং কাউন্সিল যে ১০ টি তৈরি পোশাক ফ্যাক্টরিকে এলইইডি সার্টিফিকেট দিয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশের ৭টি রয়েছে। উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের কর্মস্থলে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পরিবেশ সুরক্ষা ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবসটির গুরুত্ব অনেক।

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা এবং নিরাপত্তা সুবিধা প্রতিটি শ্রমিকের বৈধ এবং আইনগত অধিকার। "পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস"-শুধুমাত্র শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা ও সেইফটি নিশ্চিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এ বিষয়ের সংগে জড়িত রয়েছে বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক মুক্তি। বিষয়টিকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করতে শ্রম আইন-২০০৬, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩ সময়োপযোগী করা হয়েছে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবসে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সকল আয়োজনের সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

তোফায়েল আহমেদ, এমপি

বাণী

প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে "শোভন কর্মপরিবেশ, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশে দ্বিতীয় বারের মত ২৮ এপ্রিল ২০১৭ জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালিত হতে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে দিবসটির তাৎপর্য অপরিসীম।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আইএলও'র সদস্যপদ লাভ করে। এসময়ে তিনি সমস্ত কলকারখানা জাতীয়করণ করেন এবং বাংলার সকল শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত করতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অবহেলিত, নিষ্পেষিত ও শ্রমজীবী মানুষসহ সকলের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে ২০২১ সালের মধ্যে সুখী, সমৃদ্ধ ও মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এ লক্ষ্য অর্জনে সকল শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখী কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। শিল্প ও প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালার আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সরকার জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল গঠন করেছে। এ কাউন্সিলের নিয়মিত পরিদর্শন এবং তদারকিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ইতোমধ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে ঈর্ষণীয় সাফল্য বয়ে এনেছে সরকার।

কর্মক্ষেত্রে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে আমরা কাজ করছি। "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৭" শ্রমিকদের সুস্থ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ, ন্যায্য মজুরিসহ সুষম অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

দেশের উৎপাদন, উন্নয়ন ও সামগ্রিক অগ্রগতিতে শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের অবদান অপরিসীম। শ্রমজীবী মানুষের জন্য একটি শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়োজিত "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৭" এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ মুজিবুল হক, এমপি

বাণী

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ২০১৩ সাল থেকে প্রতি বছর ২৮ এপ্রিল জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস প্রতিপালন করার বিষয়টি পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে **শোভন কর্মপরিবেশ, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ** এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কে দেশব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্বিতীয়বারের মত দেশব্যাপী 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' উদযাপিত হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে দিবসটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

বর্তমান শ্রম বান্ধব সরকার 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে টেকসই শিল্পায়নের কোন বিকল্প নেই। আর টেকসই শিল্পায়নের মূল চালিকা হিসেবে কাজ করছেন মালিক-শ্রমিক ও বিভিন্ন স্তরের শ্রমজীবী মানুষ। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নের মহাসড়কে প্রবেশ করেছে এবং আমাদের এ অগ্রযাত্রা সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা ও সচেতনতায় আরো বেগবান হবে বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্মস্থলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার সাম্প্রতিককালে শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য নানামুখী যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শ্রম আইন সংশোধনের মাধ্যমে প্রতিটি কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পিপিপি-এর মাধ্যমে গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে ২টি পেশাগত রোগের চিকিৎসায় বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি সেইফটি ইনিস্টিটিউট গঠনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু, মারাত্মক আঘাত এবং পেশাগত রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে একদিকে শ্রমিক পরিবারে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ নেমে আসে, অপরদিকে কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়াসহ প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মূলত: নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব কারখানা মালিকের। সরকার এ বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট নজর দিয়ে পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করেছে। সাথে সাথে এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য দেশে "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" পালন করছে।

আমি "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৭" এর সাফল্য কামনা করছি।

মিকাইল শিপার

সভাপতি
বিকেএমইএ

বাণী

বাংলাদেশ সরকারের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস-২০১৭" উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ সময়োচিত এবং কার্যকরী পদক্ষেপ। বিকেএমইএ'র পক্ষ থেকে উক্ত উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে প্রবেশের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সেখানে শিল্প বিকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আর শিল্প বিকাশের কারণে শ্রমিকের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সংখ্যাও স্ফীত হচ্ছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, শিল্পের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নীতকরণে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং এজন্য নীট কারখানাগুলোর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা পদ্ধতিতে আধুনিকতার সংমিশ্রণ প্রয়োজন। একথা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে যে, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশে বিনিয়োগ কেবল খরচ নয়, এটি উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম উপায়ও বটে। অর্থাৎ কর্মপরিবেশের উন্নতির জন্য বিনিয়োগ করা হলে, তা প্রকারান্তরে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

তাই পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি যেখানে একটি শিল্পের উৎপাদনশীলতা ও সামগ্রিকভাবে ঐ প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে জড়িত, সেখানে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের শিল্পকাঠামোতে মালিক-শ্রমিক-সরকার সকল পর্যায়ে জাতীয়ভাবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি এখন সময়ের দাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই, নীট শিল্পে পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানগুলোর বড় ধরনের বিনিয়োগের প্রয়োজন হচ্ছে। কিন্তু এটি নিশ্চিত করতে পারলে আমাদের উৎপাদন এবং উৎপাদিত পণ্যের মান দুই-ই বাড়বে এবং এর উৎকর্ষতা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়বে। আমরা আনন্দিত যে, উৎপাদন বৃদ্ধিসহ ২০২১ সালের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং পরিবেশ-বান্ধব সবুজ শিল্প কারখানা নির্মাণ ও সবুজ অর্থনীতিতে রূপান্তরের পথে দারুণভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। উক্ত পরিবর্তনগুলোই সাক্ষ্য দেয়, নীটশিল্প খাতে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গর্ব করার মতো জায়গায় এসেছে বাংলাদেশ।

আনন্দের সাথে উল্লেখ করতে চাই যে, বিকেএমইএ প্রতিষ্ঠার সুচনালগ্ন থেকেই সদস্য কারখানাগুলোতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শ্রমিকদের বিভিন্নরকম স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এছাড়া, কর্মীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি-সুরক্ষা এবং কাজের উন্নত পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে পেশাদার স্বাস্থ্য পরিসেবা এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মীরা যাতে এই পরিসেবার সুযোগ নিতে পারে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের প্রতি সাধুবাদ জানাচ্ছি। বিকেএমইএ উক্ত পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিশেষ করে, শিল্পকারখানায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপদ উৎপাদন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যক্রম অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন গঠনমূলক পদক্ষেপের কারণে পোশাক শিল্পকারখানায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বাস্তবায়নে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে; যা পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপদ উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পরিবেশ সুরক্ষাসহ উৎপাদন এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য ভূমিকা রাখছে। আমি আশা করছি আমরা অদূর ভবিষ্যতে শিল্পকারখানায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বাস্তবায়নে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মতো ভূমিকা রাখতে সক্ষম হব।

আমি "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস-২০১৭"-এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

এ.কে.এম সেলিম ওসমান, এমপি

বাণী

সভাপতি
বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন

প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশও এ দিবসটি উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কলকারখানায় শিল্পসম্মত উপায়ে কাঁচামাল থেকে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করতে গিয়ে শ্রমজীবী মানুষ অনেক প্রকার স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে তার অনেকাংশই আমাদের অজানা। আধুনিক অনেক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের প্রচেষ্টা যেমন অব্যাহত রয়েছে, সাথে সাথে বাড়ছে দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্য হুমকির পরিমাণ।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে স্বাস্থ্যঝুঁকির পরিমাণ বাড়ছে। বিভিন্ন দেশে প্রতিনিয়ত লোমহর্ষক দুর্ঘটনা ঘটছে। একদিকে শ্রমজীবী মানুষের জীবন বিপন্ন হচ্ছে, অন্যদিকে দুর্ঘটনার কারণে শিল্প ধ্বংস হচ্ছে। ১৯৮৪ সালে এ উপমহাদেশে ভারতের ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানায় মর্মান্তিক বিস্ফোরণ বিশ্বকে নাড়া দিয়েছিল। কলকারখানায় বিস্ফোরণ, দুর্ঘটনা, অস্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ যেমন জীবজগতের জন্য হুমকিস্বরূপ তেমনি বিভিন্ন ধরনের কারখানা থেকে নির্গত ও নিঃসৃত বিষাক্ত ধোঁয়া, গ্যাস, বাষ্প, রাসায়নিক দ্রব্য, আবর্জনা ইত্যাদি শ্রমজীবী মানুষসহ সকল জীবকুলের জন্য হুমকির কারণ হচ্ছে।

তবে বাস্তব বিবেচনায় দ্রব্য উৎপাদন বা শিল্পপ্রক্রিয়া বন্ধ করা যাবে না। উন্নয়নের প্রবহমান ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। সাথে সাথে উন্নত কর্মপ্রণালী এবং আধুনিক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সব রকমের অনুমোদনযোগ্য প্রচেষ্টা নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য এককভাবে মালিক বা শ্রমিক অংশগ্রহণ করবে না। মালিক, শ্রমিক এবং সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলে অংশগ্রহণ করে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। আসুন, আমরা সহনশীল কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠিত করি। শিল্প স্থাপিত হোক, উৎপাদন অব্যাহত থাকুক এবং কর্মক্ষেত্র নিরাপত্তাপূর্ণ হোক।

'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৭' সফল হোক।

সালাহউদ্দীন কাসেম খান

সভাপতি
বিজিএমইএ

বাণী

বাংলাদেশে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিক নির্দেশনায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের উদ্যোগে গত বৎসরের ন্যায় এবারও দ্বিতীয়বারের মতো ২৮শে এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে জাতীয়ভাবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসটি উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে জেনে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিজিএমইএ'র সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা বাংলাদেশের শতভাগ রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এ্যাকর্ড, এ্যালায়েন্স ও আইএলও-এর উদ্যোগে কারখানাসমূহে বিল্ডিং, ফায়ার ও ইলেট্রিক্যাল সেইফটি ইস্যুতে নিয়মিত পরিদর্শন এবং তাদের দেয়া পরামর্শ মোতাবেক প্রয়োজনীয় সংশোধন করে উন্নত ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিটি কারখানাতে সেইফটি কমিটি গঠনপূর্বক পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি চর্চার পরিবেশ গড়ে তোলা হচ্ছে। বিজিএমইএ'র উদ্যোগে ও আইএলও'র সার্বিক সহযোগিতায় বিজিএমইএ-তে সেইফটি ইউনিট গঠনপূর্বক কারখানার শ্রমিকগণকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও বিজিএমইএ-এর সেইফটি শাখা দীর্ঘদিন যাবৎ পোশাক শিল্প কারখানাসমূহে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত মনিটরিং, সেইফটি প্রশিক্ষণ ও নিরাপদ বহির্গমন মহড়া পরিচালনাসহ ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিচালনা করে আসছে।

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে টিকে থাকার জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরী। আর এই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে জড়িয়ে রয়েছে শ্রমিকের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ। নিরাপদ কর্মপরিবেশে সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় নিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার সাথে বিজিএমইএ একাত্মতা ঘোষণা করছে। বিজিএমইএ মনে করে দিবসটি পালনের মধ্য দিয়ে রপ্তানীমুখী তৈরী পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তাগণ নিরাপদ কর্মপরিবেশ উন্নয়নে উৎসাহিত হবেন।

রপ্তানীমুখী তৈরী পোশাক খাতের রপ্তানীর লক্ষমাত্রা অর্জনের যে পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি তা বাস্তবায়নের জন্য মালিক-শ্রমিক-সরকার সকলকে এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি এবং সরকার কর্তৃক আয়োজিত "পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৭" এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ,

Rahman

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান

সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক লীগ

বাণী

কলকারখানার কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া ও উদ্ভূত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজা ধ্বসে সেখানকার পাঁচটি পোশাক কারখানার প্রায় ১১৩৭ জন শ্রমিক নিহত হন, যা শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে পেশাগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি রাখার পাশাপাশি শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে শিল্প মালিক ও শ্রমিকদের সোচ্চার করে তোলে।

বাংলাদেশে যথাযথ মর্যাদার সাথে "পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি" দিবস পালিত হচ্ছে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশের শ্রমনির্ভর অর্থনীতিতে শ্রমিক বাঁচলে শিল্প বাঁচবে, শিল্প বাঁচলে দেশ বাঁচবে।

গণতন্ত্রের মানসকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে গঠিত সরকার শ্রমিকদের প্রত্যাশার প্রতি লক্ষ্য রেখে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটিকে প্রাধান্য দিয়ে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারের শ্রমবান্ধব নীতিমালা ও কার্যক্রম দেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের অবদান অপরিসীম। সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের বিকল্প নেই। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা এবং নিরাপত্তা সুবিধা প্রতিটি শ্রমিকের আইনগত অধিকার। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে সকল শিল্প উদ্যোক্তা, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সম্মিলিত প্রয়াস একান্তভাবে কাম্য। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমরা শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন করতে সক্ষম হবো, "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৭" তে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি। দুনিয়ার মজদুর এক হও।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

আলহাজ্জ শুক্কুর মাহামুদ

মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দ্বিতীয় বারের মত "শোভন কর্মপরিবেশ, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয়ভাবে ২৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" পালন করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যসম্মত ও শোভন কর্মপরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শিল্প সেক্টরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে কর্মস্থলের শোভন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি অগ্রাধিকার পাচ্ছে। জীবনের নিরাপত্তা কর্মের প্রথম শর্ত। নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার সকল মৌলিক অধিকারের উর্ধ্বে। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার শ্রম আইনে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ যুগোপযোগী করে বেশ কিছু সংশোধনী আনয়ন করার পাশাপাশি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা" প্রণয়ন করেছে। শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও কর্মস্থলের নিরাপত্তার উপর যেখানে একটি দেশের উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকটা জড়িত, সেখানে অতি দ্রুত মালিক-শ্রমিক-সরকার সকল পর্যায়ে জাতীয়ভাবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা গৃহিত হয়েছে এবং এর আওতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয় উদ্যোগে ১৫৪৯ টি, ইউরোপীয় ক্রেতা জোট অ্যাকর্ড ১৫০৫ টি, উত্তর আমেরিকার ক্রেতা জোট অ্যালায়েন্স ৮৯০ টি এবং অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স যৌথভাবে ১৬৪ টি তৈরী পোশাক কারখানাসহ সর্বমোট ৩৭৮০ টি ভবনের কাঠামোগত, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার প্রাথমিক মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন করেছে এবং সংস্কার কাজের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন ও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালার আলোকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত কার্যক্রম নিয়মিত পরিদর্শন ও বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

বর্তমান শ্রমিকবান্ধব সরকার শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে কাজ করে যাচ্ছে। শ্রমিক-মালিক-সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্যসম্মত শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত হলে কর্মক্ষেত্রে জীবন ও সম্পদ নিরাপদে থাকবে এবং শিল্পায়ন দ্রুত এগিয়ে যাবে-এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া

মহাপরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

বাণী

"জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৭" উপলক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিক-নির্দেশনায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দেশে দ্রুত নগরায়ন, শিল্পায়ন, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার এবং ক্রমবর্ধমানহারে বহুতল/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ফলে অগ্নি-দুর্ঘটনার ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ নতুন মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে শিল্প কারখানায় কর্মরত সকলের নিরাপত্তা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা বজায় রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য কর্মক্ষেত্রে কী ধরনের অগ্নি-দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে এবং ঝুঁকি মোকাবেলায় কী করণীয় তা সকলের জানা উচিত। কর্মক্ষেত্রে সকলকেই নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সংগে গ্রহণ করতে হবে। প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে সব ধরনের অগ্নিনিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দেশে অগ্নি-দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাসে এবং কার্যকর অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে বিশেষ করে শিল্প কারখানায় অগ্নি নিরাপত্তা জোরদারকরণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সকলের সমন্বিত উদ্যোগে কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়।

আমি "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৭"-এর সাফল্য কামনা করছি।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী আহাম্মেদ খান, পিএসসি

International Labour Organization

Country Director

ILO Country Office for Bangldesh

Message

Over the past four years we can share pride in the progress made to enhance workplace safety in Bangladesh.

There have been many achievements. The inspection of virtually all garment factories for structural, fire and electrical safety was a major milestone. Regulators are carrying out their role far more effectively. Employers and workers organisations have embraced efforts to build a culture of Occupational Safety and Health. Meanwhile workers on the factory floor are increasingly safety conscious.

However our commitment to build safe workplaces must not waver. The remediation of garment factories must push ahead without delay. A newly created Remediation Coordination Cell (RCC) supported by ILO with funding from Canada, the Netherlands and the United Kingdom will support this process for factories under the National Initiative.

The launch of the RCC marks the further institutionalization of the workplace safety efforts necessary for a culture of Occupational safety and Health to truly take root in Bangladesh.

We must continue to support reform of the labour inspectorate and fire service, both of which play an integral role relating to safety, not only in the RMG sector, but across all workplaces. In addition, continual efforts must be made to ensure that workers, managers and owners in all industries are all aware of their rights and responsibilities regarding safety.

The theme of the 2017 World Day for Safety and Health at Work focuses on the critical need for countries to improve their capacity to collect and utilize reliable occupational safety and health data. This is one area in which the regulators in Bangladesh are making good progress through more systematic data gathering and the introduction of information management systems. Additionally, Bangladesh needs to emphasize the establishment of a national OSH Management System to help create safe workplaces.

As we look forward, ILO with the support of its partners is committed to continuing efforts to build safety. I congratulate the Department of Inspections for Factories and Establishments on organising this second National OSH Day and the Government of Bangladesh, BEF, BGMEA, BKMEA, NCCWE and IBC for their hard work over the past four years. This is the perfect time to reflect on what has been achieved and to energise all our efforts to ensure safe workplaces and Decent work for each and every worker.

Srinivas B. Reddy

Benoît-Pierre Laramée
High Commissioner of
Canada to Bangladesh

Leoni Margaretha Cuelenaere
Ambassador of the Kingdom
of the Netherlands to Bangladesh

Alison Blake
British High Commissioner
to Bangladesh

Donors Message

National Safety Day is an occasion to mark the progress Bangladesh has made towards improving safety in the workplace.

In just a few short years, considerable changes have taken place, both in attitudes and practice, with much focus on the all-important readymade garment sector.

The combined efforts of many stakeholders have contributed to these achievements. The governments of Canada, the Netherlands and the United Kingdom are pleased to have supported this process through the ILO's Improving Working Conditions in the Ready Made Garment Sector programme.

Since 2013, this initiative has made a major contribution to safety in the RMG sector. The inspection of some 1,500 RMG factories for structural, fire and electrical safety is a significant achievement. Not only have the factories been inspected but the institutional foundations have been created upon which future remediation efforts will be based.

The programme has also worked closely with the Department of Inspections for Factories and Establishments (DIFE) to support its reform process. The organisation of this second National Safety Day is testimony to its enhanced capacity and the proactive approach DIFE is now taking towards promoting a culture of safety.

Working conditions here in Bangladesh are important to the people of Canada, the Netherlands and the United Kingdom. Consumers in our countries as well as many others around the world take great interest in the conditions in which their clothes are produced.

It is therefore heartening to see such good progress being made towards creating safer working conditions. We firmly encourage Bangladesh to continue to walk along this path and ensure that the men and women who contribute so much to the development of the nation do so in conditions of security and safety.

Canada

Kingdom of the Netherlands

UKaid

সম্পাদকীয়

"শোভন কর্মপরিবেশ, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ"-স্লোগান নিয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে এবছর দ্বিতীয়বারের মতো পালিত হচ্ছে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৭। শ্রমিক, মালিক ও সরকার সবাই কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সেইফটি রক্ষায় সচেতন হবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এটিই হলো এ দিবসের মূল চেতনা। প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল সারা বিশ্বে পালিত হয় "পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" যা আমাদেরকে পেশাক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে আরো সচেতন হওয়ার শিক্ষা দেয়।

আমাদের জাতীয় জীবনে এ দিবসটির গুরুত্ব অপরিসীম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন-২১ অর্জনে বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ গড়তে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। এসব শিল্পের কর্মপরিবেশ সুষ্ঠু, স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ রাখার কোন বিকল্প নেই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ সম্প্রতি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে সারাবিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার ২০১৬ সালে জাতিসংঘের গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনেও ব্যাপক সাফল্য অর্জন করতে বদ্ধপরিকর। জাতিসংঘের নতুন এ লক্ষমাত্রায় টেকসই শিল্পায়ন, স্বাস্থ্য, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর আবাস এবং টেকসই উৎপাদনকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে সাথে জাতিসংঘ নির্ধারিত ২০৩০ সালের মধ্যে নতুন এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে চায়। এজন্য বাংলাদেশের পেশাগত ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সর্বোচ্চ সফলতা অর্জন একটি অপরিহার্য বিষয়।

মালিক ও শ্রমিকদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসের অংশ হিসেবে দিবসটিতে আমরা পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক স্মরণিকা প্রকাশ করেছি। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালনরত গুণীজনের বাণী, নির্দেশনা ও লেখা এ স্মরণিকায় স্থান পেয়েছে যা বাংলাদেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি রক্ষায় পাথেয় হয়ে থাকবে। মালিক-শ্রমিক সবাই পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সচেতন হোক। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুক এই হোক এ দিবসের অঙ্গীকার।

এবিএম সিরাজুল হক (৪৫০৩)
উপসচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
ও
আহ্বায়ক
স্মরণিকা প্রকাশনা কমিটি

বিষয়সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১. শোভন কর্মপরিবেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ	২১
০২. নীট শিল্পে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বাস্তবায়নঃ বিকেএমইএ'র কার্যক্রম	২৪
০৩. বাংলাদেশে OSH চর্চা	২৮
০৪. কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	৩৩
০৫. শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে শ্রম পরিদপ্তর	৩৯
০৬. কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার গুরুত্ব	৪২
০৭. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বাস্তবায়নে তৈরি পোশাক শিল্প মালিক সংগঠনের উদ্যোগ, অগ্রগতি ও পরিকল্পনা	৪৪
০৮. Preventive Healthcare Solution to Improve Occupational Health and Wellness at Workplaces in Bangladesh.	৪৬
০৯. Occupational Health and Safety: Perspective of Shipbreaking Industry in Bangladesh	৫১
১০. পেশাগত রোগ: প্রতিরোধ ও প্রতিকার	৫৬
১১. Building a culture of workplace safety in Bangladesh	৬০
১২ প্রেক্ষাপট শ্রম আইন: পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	৬৩
১৩. নারী শ্রমিকের স্বাস্থ্য ঝুঁকি	৬৫
১৪. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতঃ ঝুঁকি, নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনা রোধে করণীয়	৬৭
১৫. Improving OSH conditions in the Construction Industries: Bangladesh Perspective	৭২
১৬. বাংলাদেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংস্কৃতি গড়ে তোলার সম্ভাবনাঃ সম্ভাব্য প্রতিকুলতা ও সমাধান	৭৬
১৭. Accident causation and prevention	৭৮
১৮. DIFE-The light of Hope	৮১
১৯. জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপনের কিছু উল্লেখযোগ্য মূহুর্ত	৮৩
২০. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু চিত্র	৮৮

শোভন কর্মপরিবেশ
এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান করে নেবার স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। প্রবৃদ্ধি অর্জনে অতীতের সব রেকর্ড ছাপিয়ে শিল্পখাতের ক্রমবিকাশ ও বহুমুখী বিস্তারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নের মহাসড়কে প্রবেশ করেছে। শিল্পবিকাশ ও বৈদেশিক বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সুষম উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেশে একশটি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে। ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ এখন স্বপ্ন দেখছে দারিদ্র্য শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার। দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি বাণিজ্যের প্রসার ও রপ্তানি আয়বৃদ্ধিতে শিল্পখাত সমৃদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী ২০২১ বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করতে হলে পরিকল্পিত শিল্পোন্নয়নে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে মালিক, শ্রমিক ও সরকারকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির ভিত্তি রচনা করে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদাপূরণ, এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্বল্প সময়ের মধ্যে দারিদ্র বিমোচন, শ্রম আইন যুগোপযোগীকরণ, ন্যূনতম মজুরি পুন:নির্ধারণ, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশু শ্রম নিরসন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অধিকতর সমন্বয় সাধন ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ কে যুগোপযোগী ও আরো শ্রমবান্ধব করার লক্ষ্যে ২০১৩ খৃস্টাব্দে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে এবং আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে ২০১৫ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।

শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ও কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৪ খৃস্টাব্দে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। দেশে শিল্পঘন এলাকার ২৩টি জেলায় ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। অধিদপ্তরের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যে ৯টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন স্থাপনের কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে পৌঁছেছে। অবশিষ্ট ১৪টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ প্রায় আটগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাঠপর্যায় পরিদর্শন কার্যক্রম গতিশীল করতে পর্যাপ্ত যানবাহনসহ আধুনিক অফিস সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে। শ্রমিকদের সু-চিকিৎসার জন্য নারায়ণগঞ্জ এবং টঙ্গীতে ২টি বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপনের কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকগণের সু-চিকিৎসা প্রদানসহ শ্রমিক পরিবারের মেধাবী সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এসকল কার্যক্রমের পাশাপশি কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর করা হয়েছে 'জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল'।

শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় মাঠপর্যায়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় উদ্যোগে ইতোমধ্যে ১৫৪৯টি পোশাক শিল্প কারখানা ভবনের Assesment সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও

ইউরোপিয়ান ক্রেতাদের সংগঠন ACCORD কর্তৃক ১৫০৫টি, উত্তর আমেরিকার ক্রেতা সংগঠন Alliance কর্তৃক ৮৯০টি এবং এ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স কর্তৃক যৌথভাবে ১৬৪টি কারখানা Assesment সম্পন্ন করা হয়েছে। Review Panel পরিদর্শিত কারখানাসমূহের মধ্যে সেইফটি ঝুঁকির কারণে ৩৯টি কারখানা সম্পূর্ণভাবে এবং ৪৭টি কারখানার আংশিক কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। National Initiative কর্তৃক Assesment মূল্যায়নকৃত কারখানাসমূহে সংস্কার কাজ তদারকির জন্য জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কমিটির (NTC) ১১তম সভায় Remediation Co-ordination Cell (RCC) গঠন করা হয়েছে। RCC-এর কার্যক্রমের সাথে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ছাড়াও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বৈদ্যুতিক পরিদর্শক এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (PDK) সম্পৃক্ত রয়েছে। এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জনবল এবং অফিস ভবন ভাড়াসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের সামগ্রিক আর্থিক সহযোগিতা আইএলও-এর আরএমজি প্রকল্পের মাধ্যমে কানাডা, নেদারল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদান করা হচ্ছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন কার্যক্রম অধিকতর মানসম্পন্ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পরিদর্শকগণকে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। পরিদর্শকগণের দক্ষতাবৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে ৪টি ব্যাচে ১৫৯ জন পরিদর্শকে ৪০ দিনব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান ৫ম ও ৬ষ্ঠ ব্যাচে ৮০ জন পরিদর্শকের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে নিজস্ব বিশেষজ্ঞ তৈরির লক্ষ্যে ৮০ জন পরিদর্শককে প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ইটালীর তুরিনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে দূর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ৪৫ জন পরিদর্শক পেশাগত স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ডিসেম্বর'১৬ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ৩৭টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ৮৯ জন পরিদর্শককে উন্নত পরিদর্শন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে আইএলও-এর সহযোগিতায়, খাতভিত্তিক মালিক এবং শ্রমিকগণের সাথে পৃথক পৃথক ভাবে উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজনের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংস্কৃতি গড়ে তোলার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কারখানা পর্যায়ের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকল্পে শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী সেইফটি কমিটি গঠন ও তা কার্যকর করার জন্য নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে মালিক কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা হচ্ছে। আইএলও, আরএমজি প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের ভিত্তিতে সেইফটি কমিটির সদস্যগণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অধিদপ্তরের সক্ষমতাবৃদ্ধি ও কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা ছাড়াও জার্মানী এবং ডেনমার্ক সরকারের সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে।

বিশ্বমানের পরিদর্শন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধানসমূহ অন্তর্ভূক্ত করে একটি সমন্বিত পরিদর্শন চেকলিস্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিদর্শন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিদর্শন ও পরিদর্শকগণের কাজের মনিটরিং কার্যক্রম হাতে নেয়া হচ্ছে।

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করার মাধ্যমে শোভন কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠায় সরকারের সাথে একযোগে কাজ করছে বিভিন্ন শ্রমিক ও মালিক সংগঠন এবং দেশি-বিদেশী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা। আমরা বিশ্বাস করি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করার মাধ্যমে শোভন কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত হবে যা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন
ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন এর মহাপরিচালক গাই রাইডার (বা থেকে ষষ্ঠ)

নীট শিল্পে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বাস্তবায়নঃ বিকেএমইএ'র কার্যক্রম

এ. কে. এম. সেলিম ওসমান, এমপি
সভাপতি, বিকেএমইএ

এশিয়ার দ্রুত-বর্ধনশীল স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাম্প্রতিক ধারাবাহিকতা মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পথ রচনা করেছে। শ্রমশক্তির সহজ লভ্যতা, কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান এবং দক্ষ জনশক্তি আগামী দিনে বাংলাদেশকে সর্বনিম্ন খরচে উৎপাদনকারী দেশগুলোর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করবে। রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ, রেমিটেন্স প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, কৃষিখাতের স্বনির্ভরতা আনয়ন, পোশাক শিল্পখাতের দ্রুত অগ্রগতি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে অভাবনীয় সাফল্যের পরে, বাংলাদেশের সামনে এখন নতুন চ্যালেঞ্জ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন। এসডিজি'র জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য মাত্রাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লক্ষ্য হচ্ছে শোভন কাজের পরিবেশ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পরিবেশগত দিক দিয়ে টেকসই ও নৈতিক উৎপাদন, লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি।

এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারি বিভিন্ন পরিকল্পনার সাথে বেসরকারি খাতসমূহও সরাসরি সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের বেসরকারি খাতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সম্ভাবনাময় খাত হচ্ছে পোশাক শিল্পখাত। এমডিজি ছিল সহায়তা নির্ভর। সেজন্য বাংলাদেশ ছাড়া অনেক দেশই এক্ষেত্রে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু এবারের লক্ষ্যমাত্রাগুলো খুবই দর্শন ভিত্তিক। সরকারি, বেসরকারি সকল উদ্যোক্তার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর সিএসআর কার্যক্রম এসডিজি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় এক্ষেত্রে নের্তৃত্ব দিতে পারে পোশাক শিল্পখাত।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকা শক্তি হচ্ছে পোশাক শিল্পখাত। রপ্তানির পরিমাণ ও দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনে পোশাক শিল্প বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করেছে ২য় বৃহত্তম দেশ হিসেবে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের মধ্যে নীটওয়্যার শিল্পখাতের পণ্যের চাহিদা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর নীটওয়্যার খাতকে বিশ্বব্যাপী এগিয়ে নিতে কাজ করছে বিকেএমইএ। বিকেএমইএ একটি সৃষ্টিশীল এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রমের সংগঠন হিসেবে ধারাবাহিকভাবেই নতুন বাজার সম্প্রসারণ এবং নীট সেক্টরের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর জন্য কাজ করছে; যা পুরো শিল্পখাতের উন্নয়নে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। বিকেএমই-এর সাংগঠনিক কলেবর, সাংগঠনিক শক্তি এবং সরকারের সাথে পলিসিগত কৌশলে অংশগ্রহণের স্কেল অনেক বৃহৎ এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি। আর এ্যাপারেল ব্যবসা আন্তর্জাতিক ব্যবসা হওয়ায় বিকেএমইএ'র সুনাম এবং পরিচিতির পরিধি এখন দেশ ছাপিয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। সাথে আমাদের কমপ্লায়েন্স, গবেষণা কার্যক্রম, প্রোডাক্টিভিটি, গ্রীন ইন্ডাষ্ট্রি ডেভেলপমেন্ট, ফায়ার সেফটি কার্যক্রমসহ আনুষঙ্গিক কর্মপরিকল্পনাগুলো সংগঠন হিসেবে বিকেএমইএ'র পরিধিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেছে। বিকেএমইএ তাই যতটা না 'এসোসিয়েশন', তার চেয়েও বেশি এটি এখন 'অর্গানাইজেশন'।

উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নীটওয়্যার খাত থেকে ১৩.২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমানের পণ্য রপ্তানি হয়েছে; যা মোট পোশাক রপ্তানি খাতের ৪৯.১৩ শতাংশ এবং বাংলাদেশের মোট রপ্তানি পরিসংখ্যানের ৩৯%। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জিডিপিতে নীট সেক্টরে অবদান ছিলো ৬.০৪%। এছাড়াও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট রপ্তানি টার্গেট ১৪.১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে জুলাই'১৬ -জানুয়ারী'১৭ পর্যন্ত সর্বমোট ৮.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর নীট পণ্য রপ্তানি হয়েছে; যার প্রবৃদ্ধির হার গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.০৩% বেশী। অর্থাৎ জাতীয় অর্থনীতিতে নীট সেক্টরের প্রভূত অবদান রয়েছে এবং এ সেক্টর থেকে মূল্য সংযোজনের হারও ৭০ শতাংশেরও বেশী।

দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য দূরীকরণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে উন্নতি, সামাজিক উন্নয়ন প্রভৃতি অর্থনীতির মূল নিয়ামক। এসব কার্যক্রম ঠিক থাকলে সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনা সম্ভব। আন্তর্জাতিক উৎপাদন চেইনে বাংলাদেশের পোশাক খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শ্রমিকসম্পর্কিত সামাজিক বিষয়ের অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে কর্মরত রয়েছে ৪৫ লাখের ওপর শ্রমিক, এরমধ্যে ২০ লাখ শ্রমিক রয়েছে নীটশিল্পে। ২০৫০ সালের মধ্যে নীট শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের পরিমান দাঁড়াবে ৪.৯ মিলিয়নে, অর্থাৎ ২০৫০ সালের নীট শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ২.৯ মিলিয়ন।

পোশাক খাতের সামাজিক অবদান
কর্মসংস্থান : ৪৫ লাখ লোকের কর্মসংস্থান
নারীর ক্ষমতায়ন : শতকরা ৯১ ভাগই হচ্ছে নারী
সঞ্চয়: ১৭.৬% নারী তার অর্জিত আয় সঞ্চয় করে
নিজ ব্যাংক একাউন্ট: ৬৯% শ্রমিকের নিজস্ব ব্যাংক একাউন্ট রয়েছে
শিশু শ্রম: নিষিদ্ধ করা হয়েছে
দারিদ্র্য দূরীকরণ: ১২.৫%
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ: সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখছে।

নিম্নে উপস্থাপিত সারণীতে ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপিতে নীটখাতের অবদান দেখানো হয়েছে; যা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিপ্রবাহে নীট সেক্টরের অবদান শীর্ষস্থানীয়।

অর্থ বছর	নীটওয়্যার রপ্তানি				মোট তৈরি পোশাক রপ্তানি (মিলিয়ন ডলার)	জিডিপিতে শতকরা হার
	মূল্য (মিলিয়ন ডলার)	প্রবৃদ্ধির হার (%)	পোশাক রপ্তানিতে শতকরা হার	জাতীয় রপ্তানিতে শতকরা হার		
১০-১১	৯৪৮২.০৬	৪৬.২৫	৫২.৯৩	৪১.৩৬	১৭৯৫৪.৪৬	৭.১৮
১১-১২	৯৪৮৬.৩৯	০.০৫	৪৯.৬৯	৩৯.০৪	১৯০৮৯.৭৩	৭.৩৬
১২-১৩	১০৪৭৫.৮৭	১০.৪৩	৪৮.৬৯	৩৮.৭৬	২১৫১৫.৭৩	৮.১২
১৩-১৪	১২০৪৯.৮১	১৫.০২	৪৯.২০	৩৯.৯৩	২৪৪৯১.৮৮	৬.৯৪
১৪-১৫	১২৪২৬.৭৯	৩.১৩	৪৬.২০	৩৯.৮৩	২৬৮৯৭.৩৮	৬.৩৯
১৫-১৬	১৩৩৫৫.৪২	৭.৪৭	৪৭.৫৪	৩৮.৯৯	২৮০৯৪.১৬	৬.০৪

সূত্র ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

উপরোল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের নীটশিল্প একটি শক্তিশালী প্রতিযোগী হিসেবে বিবেচ্য। এছাড়া পোশাক শিল্পে চীনের ক্রমশ পশ্চাদপসরনের ফলে ছেড়ে যাওয়া মার্কেট শেয়ারে বাংলাদেশের জন্য নতুন সম্ভাবনা ও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। রপ্তানি বাজার বিস্তৃতিতে সরকার ও উদ্যোক্তাদের আন্তরিক মনোযোগ ও দৃষ্টিভঙ্গী নীট শিল্পের উজ্জ্বল এই সম্ভাবনার প্রতিফলনকে ত্বরান্বিত করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে নীটশিল্পের নিজ অবস্থানকে ধরে রাখার লক্ষ্যে বিকেএমইএ বরাবরই গঠনমূলক কাজ করে আসছে এবং সে উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখেই ২০০৬ সালে প্রথম সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স সেল গঠন করা হয়। উক্ত সেলটি থেকে বিকেএমইএ তার সদস্য কারখানাগুলোতে শ্রম আইন বাস্তবায়নের পাশাপাশি কর্মপরিবেশের নিরাপত্তাসহ পেশাগত স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা ও অগ্নি নিরাপত্তার উপরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে আসছে। উন্নয়ন পরিক্রমার অন্তর্ভূক্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো নীটশিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ও সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণামূলক কাজ, নতুন বাজার সৃষ্টি ও সঞ্চালনা করা, কারখানাভিত্তিক সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স মনিটরিং প্রোগ্রাম, সদস্য কারখানার মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কমপ্লায়েন্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, শ্রমিকদেরকে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, বাধ্যতামূলক অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান। এছাড়াও কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, পোস্টার, স্টিকার ইত্যাদি নিয়মিত কারখানাতে প্রদান করে আসছে।

রানা প্লাজা ও তাজরীন দুর্ঘটনার পরে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প যখন বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক চাপ-এর সম্মুখীন এবং একই সঙ্গে পোশাক শিল্পের বাজারে একটি অস্থির পরিবেশ বিরাজমান, সেই সময়ে বিকেএমইএ নীট শিল্পের বাজারকে স্থিতিশীল রাখা এবং বৈশ্বিক পরিবেশের আন্তর্জাতিক মান ধরে রাখার জন্য কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষে সদস্য কারখানাগুলোতে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম আরও ব্যাপকভাবে শুরু করে। এছাড়াও, নতুন সদস্য কারখানা অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে কারখানাতে আইনের মৌলিক বিষয়গুলোর পাশাপাশি ভবন নিরাপত্তা, অগ্নি নিরাপত্তা এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করে। একই সময়ে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকারখানার কর্মপরিবেশের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (ILO), সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থাগুলোকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প পরিচালনার কাজ শুরু করে।

"Improving The Working Condition In RMG Sector" সকল প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম একটি প্রকল্প। উল্লিখিত প্রকল্পের আওতায় বিকেএমইএ, ILO এর আর্থিক সহায়তায় তার সদস্য কারখানাগুলোর কর্মপরিবেশের মান উন্নয়নের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচীর ১ম পর্যায়ে বিকেএমই-এর ৪৩ জনকর্মকর্তা ILO এর আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, তুরিন, ইটালি থেকে Essentials of Occupational Safety & Health বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সিনিয়র মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে সার্টিফিকেট গ্রহণ করেছে। কর্মসূচীর ২য় পর্যায়ে উক্ত মাস্টার ট্রেইনারগণ বিকেএমএই-এর ২০৯টি সদস্য কারখানার সর্বমোট ৩৫৮০ জন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা, সুপারভাইজার, ও লাইন-ইন-চার্জ কে কারখানাভিত্তিক পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্বাচিত ২০৯টি সদস্য কারখানার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মধ্যম পর্যায়ের প্রত্যেক কর্মকর্তা, সুপারভাইজার ও লাইন ইনচার্জগণ তাদের স্ব-স্ব কারখানাতে কর্মরত শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। যার ফলে কারখানাতে কর্মরত মোট ৩,৫৮,০০০ জন (তিনলক্ষ আটান্ন হাজার) শ্রমিক কর্মকালীন পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবে।

কর্মপরিবেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তামূলক সেবা কার্যক্রমকে আরও জোরদার করার জন্য বিকেএমইএ একটি অকুপেশনাল সেইফটি এ্যান্ড হেলথ ইউনিট গঠন করেছে। উক্ত ইউনিটটি থেকে নীটশিল্প কারখানাগুলোতে নির্বাচিত ৪০টি কারখানাতে সেইফটি কমিটি গঠন ও এ সংক্রান্ত যাবতীয় সেবা, যেমন- কমিটির সদস্যদের তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা, ঝুঁকি নিরুপণ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

এক্ষেত্রে সামাজিক সূচকের মধ্যে রয়েছে দক্ষ জনসম্পদ, ব্যবসা শুরুর উপাদানসমূহের সহজলভ্যতা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, সামাজিক প্রতিযোগিতার মধ্যে সুষম ও নৈতিক অবস্থান তৈরী এবং সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতামূলক মনোভাব। আর অন্যদিকে রাজনৈতিক সূচকগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, পলিসি

নির্ধারণে রাজনীতির চেয়ে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোকে মূল্য বেশি দেয়া, ব্যবসায়িক শৃঙ্খলা তৈরীর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা পরিহার করা ইত্যাদি।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক সূচকগুলোকে সঠিক অবস্থানে রেখে ব্যবসায়িক পলিসি এবং পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণ করা গেলে ২০৫০ সালে বাংলাদেশের নীট শিল্প সারা বিশ্বের জন্য রোল মডেল হয়ে দাঁড়াবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বিকেএমইএ-এর সেইফটি কমিটি সদস্যদের প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশে OSH চর্চা

মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া
মহাপরিদর্শক, DIFE

সংক্ষিপ্ত শব্দ OSH-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ Occupational Safety and Health বাংলায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি। কারখানা/প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃক কর্মক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষের সেইফটি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization-WHO) Occupational Safety and Health-এর একটি সংজ্ঞা প্রদান করেছে যা এরূপ: Occupational health deals with all aspects of health and safety in the work place and has a strong focus on primary prevention of hazards। অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও সেইফটি অর্থাৎ শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং কর্মক্ষেত্রের আকস্মিক বিপদ (Hazard) নিয়ন্ত্রণ।

বাংলাদেশ OSH-এর আইনি কাঠামো: বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬-এ কর্মক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষের সেইফটি নিশ্চিত করতে ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আইনের চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও দ্বাদশ অধ্যায়ে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে এবং শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে মাতৃত্ব কল্যাণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রাপ্তির অধিকার ও প্রদানের দায়িত্ব, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা পরিশোধ সংক্রান্ত পদ্ধতি, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধার পরিমাণ, কোনো মহিলা কর্মীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রদান এবং কতিপয় ক্ষেত্রে মহিলা কর্মীর চাকুরির অবসানে বাধা প্রদানের বিষয় এ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে শ্রম আইন-২০০৬ এর ৪৬ বিধি মোতাবেক একজন মহিলা কর্মীর সন্তান সম্ভবা হবার পর সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য তারিখের পূর্বে আট সপ্তাহ এবং সন্তান প্রসবের পর আট সপ্তাহ প্রসূতি কল্যাণ ছুটি প্রাপ্য।

পঞ্চম অধ্যায়ে কর্মক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, ধূলাবালি ও ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য অপসারণ, কৃত্রিম আর্দ্রকরণ, অতিরিক্ত ভিড়ে করণীয়, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, পানীয় জলের সংস্থান, পর্যাপ্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষ রাখা এবং আবর্জনা বাক্স ও পিকদানি স্থাপন বিষয়ে বলা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভবন ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা ব্যবস্থা, অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন, যন্ত্রপাতি ঘিরে রাখা, চলমান যন্ত্রপাতির উপরে বা কাছে কাজ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন, স্ট্রাইকিং গিয়ার ও শক্তি সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করার পন্থা, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন, নতুন যন্ত্রপাতি আবৃত রাখা, ক্রেন ও অন্যান্য উত্তোলন যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা, হয়েস্ট ও লিফটে কাজ করার সময় সতর্কতা অবলম্বন, ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতি ও প্রেশার প্লান্ট নিয়ে কাজ করা, মেঝে-সিড়ি ও যাতায়াত পথ কেমন হবে তা, পিট-সাম্প-সুরঙ্গমুখ ইত্যাদি কেমন হবে, অতিরিক্ত ওজন নেয়া যাবে কিনা, চোখের নিরাপত্তা, ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রাংশ নির্ণয় অথবা স্থায়িত্ব পরীক্ষার ক্ষমতা, বিপজ্জনক ধোঁয়ার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, বিস্ফোরক বা দাহ্য গ্যাস-ধূলা ইত্যাদি নির্ণয় সম্পর্কে বলা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিশেষ বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে।এই অধ্যায়ে বিপজ্জনক চালনার ক্ষেত্রে সতর্কতা, দুর্ঘটনা সম্পর্কে নোটিশ প্রদান, কতকগুলো বিপজ্জনক ঘটনার নোটিশ প্রদান, কতিপয় ব্যাধি সম্পর্কে নোটিশ প্রদান, দুর্ঘটনা বা ব্যাধি সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা, নমুনা সংগ্রহের ক্ষমতা, কতিপয় বিপদের ক্ষেত্রে পরিদর্শকের ক্ষমতা, বিপজ্জনক ভবন ও যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে তথ্য প্রদান, কতিপয় কাজে মহিলা কর্মীর নিয়োগে বাধা-নিষেধ ইত্যাদি বিধৃত হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে কর্মক্ষেত্রে কারখানার মালিক কর্তৃক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ অধ্যায়ে কারখানায় প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জামের ব্যবস্থা রাখা, ধৌতকরণ সুবিধা প্রদান, ক্যান্টিন, বিশ্রামকক্ষ, শিশুকক্ষ, প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের আবাসন সুবিধা, চা-বাগানে বিনোদন ও শিক্ষার সুবিধা, চা-বাগানে গৃহায়ন সুবিধা, চা-বাগানে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ইত্যাদি প্রাপ্তির সুবিধা, সংবাদপত্র শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসা পরিচর্যা, বাধ্যতামূলক গ্রুপ বিমা চালুকরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়ে দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমের জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও প্রদান সম্পর্কে বলা হয়েছে।এই অধ্যায় অনুসারে কারখানায় কোনো দুর্ঘটনায় নিহতের পরিবার বা আহত শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে মালিকের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে।এছাড়াও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, মজুরি হিসাবের পদ্ধতি, পুনর্বিবেচনা, মাসিক ক্ষতিপূরণ থোক অর্থ দ্বারা পরিশোধ, ক্ষতিপূরণ বন্টন, ক্ষতিপূরণ হস্তান্তর, ক্রোক বা দায়বদ্ধকরণ নিষিদ্ধ সম্পর্কে, নোটিশ ও দাবি বিষয়ে, মারাত্মক দুর্ঘটনা সম্পর্কে মালিকের নিকট থেকে বিবৃতি তলবের ক্ষমতা সম্পর্কে, মারাত্মক দুর্ঘটনার রিপোর্ট প্রদান সম্পর্কে, চিকিৎসা পরীক্ষা, চুক্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদান, মালিকের দেউলিয়াত্ব, মাস্টার ও নাবিকের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান, ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে বিবরণী, দায়মুক্তি বা লাঘবের চুক্তি বাতিল সম্পর্কে, কতিপয় প্রশ্ন শ্রম আদালতের নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ বিষয়ে, কার্যধারার স্থান নির্ধারণ সম্পর্কে, দরখাস্তের শর্ত, মারাত্মক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শ্রম আদালত কর্তৃক অতিরিক্ত জমা তলব করার ক্ষমতা, চুক্তি রেজিস্ট্রিকরণ, চুক্তি রেজিস্ট্রি ব্যর্থতার ফল, আপিল, আপিলের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে কতিপয় পরিশোধ স্থগিতকরণ, ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদত্ত কোনো অর্থ হস্তান্তর করা সম্পর্কে অন্য কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য বিধি প্রণয়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫-এ আইন বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা-২০১৩ এ কলকারখানায় শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নীতিমালা প্রণয়ন করত: বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারের দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে OSH চর্চা: বৃটিশ শাসনামলে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে কলকারখানা স্থাপন শুরু হয়। ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে ইন্ডিয়া ও পাকিস্তান নামের দুটো দেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বৃটিশ শাসনের অবসান হলেও পূর্ববাংলা পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয় এবং বৈষম্যের শাসন চলতে থাকে। তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিবাদী হয়ে উঠেন এবং বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে নেতৃত্বদানে অভিজ্ঞ হয়ে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন। পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে এবং শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি পেশ করেন। দেশের কথা বলতে গিয়ে তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়। তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠস্বর কোনোভাবেই স্তব্ধ করতে না পেরে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। দেশের আপামর জনতা প্রতিবাদী হয়ে উঠে এবং উনসত্তরে গণজোয়ার সৃষ্টি হলে জান্তা সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। পল্টনের এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান করা হলে তিনি বাঙালি জাতির মুক্তির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে যান। সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দল আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জয়লাভ করলেও ক্ষমতা হস্তান্তর না করে সময় ক্ষেপন করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর কারসাজিতে ইয়াহিয়া সরকার কর্তৃক কাল ক্ষেপন করে একাত্তর খৃস্টাব্দের ২৫ মার্চ গভীর রাতে অপারেশন সার্চ লাইট পরিচালনা করে অতর্কিতে ঢাকার ঘুমন্ত মানুষের উপর সামরিক আক্রমণ চালিয়ে বহু নিরীহ বাঙালি হতাহত করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে প্রথমে ঢাকা সেনানিবাস ও পরে পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে বীর বাঙালিরা অস্ত্র হাতে তুলে নেয় এবং নয় মাস গেরিলা যুদ্ধ করে শেষের দিকে ইন্ডিয়ান বাহিনীর সহায়তায় হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করলে ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ নামের দেশটির অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ খৃস্টাব্দের ১০

বীরের বেশে দেশে ফিরে আসেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই বাঙালিকে দেশের মানুষ জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশের শ্রমজীবী মানুষের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে আইএলও-এর কনভেনসনে অনুসমর্থন করে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ও সংগ্রামে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই দেশে বিভিন্ন ধরনের কলকারখানা স্থাপিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে; আগামীতেও হতে থাকবে। জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপ ও সহায়তায় রপ্তানিমুখী তৈরি পোষাকশিল্পসহ সকল কারখানায় শতভাগ কমপ্লায়েন্স অর্থাৎ শোভন পরিবেশ বিদ্যমান; এছাড়াও অন্যান্য কারখানাগুলোয় সুপেয় পানির ব্যবস্থাসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক শৌচাগার, চিকিৎসা ব্যবস্থা, ডে-কেয়ার সেন্টার, ইত্যাদি আছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ রপ্তানিমুখী কারখানাসহ অন্যান্য কারখানাগুলোয় মহিলা কর্মীদের প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করছেন।

এ যাবৎ সরকারের সাফল্য: রানাপ্লাজা দুর্ঘটনার পর বর্তমান সরকারের হস্তক্ষেপে রপ্তানিমুখী তৈরি পোষাক শিল্পে কর্মপরিবেশ ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বহু কাজ করেছে:

- ✓ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করে জনবল ৩১৪ থেকে ৯৯৩ এ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সংস্থা প্রধানের পদের স্ট্যাটাস অতিরিক্ত সচিব করা হয়েছে; বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মাধ্যমে ৩১২ জন উচ্চ শিক্ষিত পরিদর্শক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- ✓ বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক সহায়তায় পরিদর্শকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ✓ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর সহযোগিতায় চারটি ব্যাচে ১৫৯ জন পরিদর্শকের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ✓ ইউরোপিয়ান ক্রেতা সংগঠন ACCORD ও উত্তর অ্যামেরিকান ক্রেতা সংঠন ALLIANCE-এর পাশাপাশি National Initiative ১৫৪৯টি তৈরি পোশাক কারখানা মূল্যায়ন (Assessment) করেছে। ACCORD করে ১৫০৫টি ও ALLIANCE করেছে ৮৯০টি। তিনটি উদ্যোগ কর্তৃক মূল্যায়িত কারখানাসমূহের মধ্যে একেবারেই নিরাপদ না থাকায় ৩৯টি কারখানা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং ৪৭টি আংশিক বন্ধ করা হয়েছে।
- ✓ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল কার্যক্রম শুরু করেছে।
- ✓ কারখানাগুলোয় সেইফটি কমিটি গঠন শুরু হয়েছে এবং এ যাবৎ ১০০টি তৈরি পোষাক কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন হয়েছে এবং গঠিত সেইফটি কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- ✓ অধিদপ্তরে মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি OSH Unit গঠন করা হয়েছে।
- ✓ একটি OSH-Kit প্রস্তুত করা হয়েছে যা পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
- ✓ দুর্ঘটনা বীমা চালু করার জন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের নিমিত্ত চার ব্যাচে ১২ জন কর্মকর্তা giz -এর সহায়তায় জার্মানিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে;
- ✓ ২০১৬ খৃস্টাব্দে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে OSH DAY উদযাপন করা হয়েছে;
- ✓ কর্মকালে শিশুর দেখাশোনার জন্য কারখানাগুলোয় ডে কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে;
- ✓ মাতৃত্ব কল্যাণ ছুটি ১২ সপ্তাহ থেকে বৃদ্ধি করে ১৬ সপ্তাহ করা হয়েছে;

- ✓ শ্রমিকদের কর্মকালে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- ✓ শ্রম পরিদপ্তরের মাধ্যমে গাজীপুরের টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় দুটি পেশাগত হাসপাতাল নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে।

সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: কলকারখানাগুলোয় OSH চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য সরকার বহুবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে-

- ✓ একটি OSH গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা;
- ✓ সকল কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন নিশ্চিত করা;
- ✓ দুর্ঘটনা বীমা ও পুনর্বাসন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা;
- ✓ শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- ✓ OSH সম্পর্কে সচেতনতা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা;
- ✓ কারখানাগুলোয় OSH DAY/সপ্তাহ উদযাপনে উদ্বুদ্ধ করা।

বেসরকারি পর্যায়ে OSH চর্চা: সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে অর্থাৎ কারখানার মালিকগণও OSH চর্চায় এগিয়ে আসছেন।

- ✓ অনেক কারখানায় বহু আগে থেকেই OSH সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে।
- ✓ রপ্তানিমুখী কারখানাগুলোয় শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে এবং শতভাগ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে;
- ✓ বিশ্বের ১০টি সবুজ কারখানার মধ্যে ৭টি-ই বাংলাদেশে; সবুজ কারখানার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ✓ ILO-এর সহায়তায় BGMEA ও BKMEA OSH সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে-কর্মশালা, সেইফটি কমিটি গঠনে সহযোগিতা প্রদান, অগ্নি নির্বাপন মহড়া, চিকিৎসা, ইত্যাদি।
- ✓ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন ৪০০ কারখানায় ৭৫০০ মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে;

উন্নয়ন সহযোগীদের OSH চর্চায় সহায়তা:

- ✓ জার্মান সংস্থা giz দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সেইফটি সংক্রান্ত সরঞ্জামাদি ও প্রয়োজনীয় গাড়ি-কম্পিউটার-ট্যাবলেট ইত্যাদি প্রদান করছে। বাংলাদেশে দুর্ঘটনা বীমা চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান অব্যাহত আছে।
- ✓ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা তথা ILO কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে Improving working condition in the RMG sector I Better Work Bangladesh নামে দুটো প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়াও Improving Fire and General Building Safety Project এর মাধ্যমে তৈরি পোষাক খাতে অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষমতা অর্জন ও বাস্তবায়নে ILO বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করছে।
- ✓ ডেনমার্ক সরকারের সহায়তায় মেশিনারি সেইফটি, স্ট্রাকচারাল সেইফটিসহ অন্যান্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।
- ✓ কোরিয়ান সংস্থা Koika কর্মস্থলের সেইফটি নিশ্চিতের বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর OSH চর্চা: পরিদর্শকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উদ্ধার সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলসমূহে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করা হচ্ছে। বিভিন্ন কলকারখানায় নিয়মিত অগ্নিনির্বাপন মহড়ার পাশাপাশি শ্রমিকদের দুর্যোগ মোকাবেলা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রচেষ্টায় দেশের সকল কারখানায় স্বাভাবিক কার্যক্রম হিসেবে OSH সংস্কৃতি শুরু হবে। তখন সকল কারখানায় শোভন পরিবেশ নিশ্চিত থাকবে। দৈবাৎ কোনো দুর্ঘটনা ঘটলেও কোনো শ্রমিক আহত বা নিহত হবে না। আহত হলেও পুনর্বাসন কেন্দ্রে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে কর্মক্ষম না হওয়া পর্যন্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রে দুশ্চিন্তাহীন অবস্থায় চিকিৎসাধীন থাকবে; কারণ দুর্ঘটনা বীমা চালু হলে পদ্বতিগতভাবেই আহতের পরিবার ক্ষতিপূরণ তথা ভরণপোষণের ভাতা পেতে থাকবে। OSH গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে পেশাগত ব্যাধি চিহ্নিত হয়ে নিরাময়ের উপায় বের হবে, যাতে আক্রান্ত শ্রমিকদের সুস্থ হবার নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে।

কলকারখানাগুলোয় শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে OSH চর্চার বিকল্প নেই। মালিক, শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর সহায়তায় OSH চর্চা স্থায়ীরূপ নেবে এবং তখন দেশের রপ্তানিমুখী সকল কারখানা সবুজ হয়ে যাবে। আর অন্যান্য কারখানাগুলোয়ও শোভন কর্মপরিবেশ বিরাজ করবে, ইনশাআল্লাহ।

অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণ

জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিলের ২য় সভা

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
প্রকৌশলী আলী আহাম্মেদ খান, পিএসসি
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

ভূমিকা ঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রূপকার, চ্যাম্পিয়নস অফ দ্যা আর্থ পুরস্কারে ভুষিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদুরপ্রসারী ও দক্ষ নির্দেশনায় বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন বাংলাদেশ আজ বিশ্বের মানচিত্রে রোল মডেল হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। এটা অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের বিষয়, বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। ক্রমবর্ধমান উন্নয়নশীল এই বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে অগ্রগতির সাথে সাথে আমাদের দেশে বহুতল ভবন, বাণিজ্যিক ভবন, শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মার্কেট, শপিং মল, হাসপাতালসহ সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে এবং অগ্নি-দুর্ঘটনাজনিত ঝুঁকিও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া অপরিকল্পিত নগরায়ন, অনিয়ন্ত্রিত অবকাঠামো নির্মাণ, অধিক জনসংখ্যার অবস্থানের প্রবণতা, সরু রাস্তা, ট্রাফিক জ্যাম, আবাসিক এলাকায় ঝুকিঁপুর্ণ কেমিক্যাল এর ব্যবহার, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ইত্যাদি কারণে অগ্নি-দুর্ঘটনা মোকাবেলা কার্যক্রম জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে।

আমরা সকলেই জানি বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। প্রায় প্রতিবছরই আমাদের দেশে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়ে থাকে। যদিও প্রতিবছর বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা আমাদের দেশ আক্রান্ত হয়ে থাকে তথাপি বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালাসমূহ বিশেষ করে Standing Order on Disaster (SOD) এবং গ্রাম বাংলার সাহসী জনগণের দুর্যোগ মোকাবেলায় উদ্ভাবনী কৌশল শুধু এশিয়াতেই নয় সমগ্র বিশ্বে দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশকে রোল মডেল হিসেবে অনুসরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের জনগনের বন্যা, খড়া, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকলেও তাদের ভূমিকম্পের ভয়াবহতা সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। ভৌগলিক অবস্থান এবং টেকটনিক প্লেটের অবস্থানের কারণে ভূমিকম্পের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত। জাতিসংঘ প্রণীত Earthquake Disaster risk Index অনুযায়ী পৃথিবীর সবচেয়ে ঝঁকিপূর্ণ ২০ টি শহরের মধ্যে ঢাকা অন্যতম। উপরন্তু সবচেয়ে মারাত্নক প্রাকৃতিক দুযে াগ যার কোন পূর্বাভাসের ব্যবস্থা নেই সেই ভূমিকম্পের আশঙ্কার কথাও বিশেষজ্ঞগণ বেশ গুরুত্বের সংগে ব্যক্ত করেছেন এবং ঢাকা শহরকে বিশ্বের দ্বিতীয় ঝুঁকিপূর্ণ শহর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এছাড়া, বাংলাদেশ পৃথিবীর ভুমিকম্প প্রবন অঞ্চল তথা হিমালয় বেল্টে অবস্থিত বিধায় প্রাচীনকাল থেকে এদেশে মাঝে মাঝে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশে ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত বেশি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে- (ক) অতিমাত্রায় জনসংখ্যার ঘনত্ব (খ) অধিক ভবন (গ) অপরিকল্পিত অবকাঠামো (ঘ) শহরাঞ্চলে খোলা জায়গার অভাব ও সরু গলিপথ (ঙ) লাইফ লাইনসুহের যেমনঃ বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যাবস্থা, রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট ইত্যাদির দুরবস্থা। সুতরাং ভুমিকম্প তথা যে কোন দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মোকাবেলায় সকল স্তরে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির কোন বিকল্প নেই; আর প্রস্তুতি বৃদ্ধি এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন

একটি জরুরী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। অগ্নি দুর্ঘটনাসহ যে কোন মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় এ বিভাগের কর্মীগণ দিনরাত ২৪ ঘন্টা মানবসেবায় নিয়োজিত। জনগণের জানমাল রক্ষার্থে এ অধিদপ্তরের প্রতিটি সদস্য নিবেদিত প্রাণ। যে কোন অগ্নি দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে এ বিভাগের কর্মীগণ তড়িৎ ঘটনাস্থালে ছুটে যান এবং নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও মানুষের জানমাল রক্ষার্থে ঝাঁপিয়ে পড়েন। গতিসেবা ত্যাগের মুলমন্ত্রে উজ্জীবিত এ বাহিনীর সদস্যদের সেবামূলক কর্মতৎপরতার জন্য মানুষের নিকট "জীবন রক্ষাকারী বাহিনী" বা The Life Saving Force হিসেবে পরিচিতি এবং আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

ভিশন ঃ "অগ্নিকান্ডসহ সকল দুর্যোগ মোকাবেলায় এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সক্ষমতা অর্জন করা।"
মিশন ঃ "দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মোকাবেলায় মানুষের জানমাল রক্ষার মাধ্যমে একটি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।"

মৌলিক দায়িত্ব ও কার্যক্রম

- দিবা-রাত্র যে কোন সময় সংঘটিত অগ্নিকান্ড মোকাবিলা করা।
- অগ্নিকবলিত এবং বিধ্বস্ত ভবনসহ জাহাজ, লঞ্চ, নৌকাডুবি, যে কোন দুর্ঘটনায় উদ্ধার কাজ পরিচালনা করা।
- সরকার নির্ধারিত ভাড়ায় এ্যাম্বুলেন্সযোগে রোগী পরিবহন।
- বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ফায়ার লাইসেন্স প্রদান ও বহুতল ভবনের অগ্নি নিরাপত্তামূলক ছাড়পত্র প্রদান।
- অধিদপ্তরের জনবলকে অগ্নি নির্বাপন,উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সরকারকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৌশলগত পরামর্শ প্রদান করা, ইত্যাদি।

দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মোকাবেলায় চ্যালেঞ্জসমূহ

- অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়ন।
- অপরিকল্পিত কেমিক্যাল সংরক্ষণ এবং গুদামজাতকরণ।
- Chemical Biological Radioactive Nuclear Explosive (CBRNE) সংক্রান্ত ঝুঁকি (নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট)।
- বিএনবিসি অনুসরণ না করে ভবন নির্মাণ।
- যানজট/ ট্রাফিক জ্যাম।
- সরু রাস্তা।
- অপারেশনাল জনবলের স্বল্পতা।
- পুরাতন ও জরাজীর্ণ ফায়ার স্টেশন, দপ্তর, আবাসিক ভবন ও অপ্রতুল সাজসরঞ্জামাদি।
- শিল্প এলাকাসহ নগর অঞ্চলে অপ্রতুল ফায়ার সার্ভিস স্টেশন।
- জনবলের অভাব।
- প্রচলিত আইন, বিধিবিধান ও অগ্নি দূর্ঘটনা সম্পর্কে জনসাধারনের অসচেতনতা।
- শহর/শিল্প/বাণিজ্যিক/বস্তি এলাকায় অগ্নি নির্বাপণ কার্যে পানির স্বল্পতা/দুস্প্রাপ্যতা।
- একই ভবনে বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠান ও আবাসনের অবস্থান (মিক্সড অকুপেন্সী)।
- আবাসিক প্রকল্পসমূহে ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে স্থান সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা।
- আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর নিয়ন্ত্রণ কক্ষের অভাব।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে অগ্নিকান্ড সম্পর্কে সঠিক সময় এবং সঠিক তথ্য প্রদান করা হয় না।
- বাধামুক্ত ও নিরাপদ জরুরী বহির্গমন পথ সংরক্ষণ না করা।
- সিঁড়িপথে মালামাল রেখে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং এ মালামাল অগ্নিকান্ড বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

- অপর্যাপ্ত উচ্চতর/বৈদেশিক প্রশিক্ষণ।
- অগ্নিদুর্ঘটনায় মোকাবেলার সময় উৎসুক জনতার ভিড়।
- বহুতল ভবনের ছাড়পত্র গ্রহণ না করা।
- শিল্প প্রতিষ্ঠানে ফায়ার লাইসেন্স গ্রহণ না করা।
- ফায়ার লাইসেন্সের শর্ত পালনে অনীহা ও অজ্ঞতা।
- অগ্নিদুর্ঘটনা বিষয়ে যথোপযুক্ত জনসচেতনতার অভাব।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপসমুহ

- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিয়মিত অত্র অধিদপ্তরের ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টরের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বাণিজ্যিক ভবন, আবাসিক ভবন, বহুতল ভবন, হাসপাতাল, বস্তিসহ সকল ক্ষেত্রে পরিদর্শন করা হচ্ছে।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক পরিদর্শন করা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
- সকল জনগণের জন্য অগ্নি প্রতিরোধ, অগ্নি নির্বাপণ, ইভাকুয়েশন, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া সার্ভে ও মহড়া আয়োজন করা হচ্ছে। ২০১৬ সালে মোট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ২৩৯২৩১ জনকে, সার্ভে করা হয়েছে ৩৭৪২ টি প্রতিষ্ঠান, মহড়া পরিচালনা করা হয়েছে ৫৪৭৯ টি এবং গণসংযোগ করা হয়েছে ১১৬৩৪ টি।
- ভূমিকম্প পরবর্তী অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ০৯টি স্পেশাল সার্চ এন্ড রেসকিউ টিম গঠন করা হয়েছে (০১টি অধিদপ্তরে, ০১টি প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সে ও প্রতি বিভাগে ০১টি করে টিম রাখা হয়েছে)।
- বহুতল/বাণিজ্যিক ভবন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং গার্মেন্টস কারখানায় ভবন ও অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি সঠিক আছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে। আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে আর্থিক জরিমানাসহ বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- দেশের প্রতিটি জেলা/উপজেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ,সরকারি ও বেসরকারি দপ্তর, হাসপাতাল, মিডিয়া, বস্তি, সামাজিক সংগঠন ও সংস্থায় নিয়মিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া।
- প্রত্যেক ফায়ার স্টেশন কর্তৃক আওতাধীন এলাকায় টপোগ্রাফিসহ গণসংযোগ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।
- জনসাধারনের অগ্নি দূর্ঘটনা সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম যেমন ঃ টকশো, র‍্যালী, মহড়া, ফায়ার সপ্তাহ, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, গণসংযোগ ইত্যাদি পরিচালনা করা হচ্ছে।
- আরো দক্ষতার সাথে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প চলমান রয়েছে। বর্তমানে ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা হল ৩২০টি, আগামী ২-৩ বৎসরের মধ্যে প্রতিটি উপজেলায় ন্যুনতম ০১টি করে ফায়ার স্টেশন বিদ্যমান থাকবে এবং সর্বমোট ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা হবে প্রায় ৫৫৬টি এবং সর্বমোট জনবল হবে প্রায় ১৫০০০ জন।
- যেকোন দুর্ঘটনায় যেহেতু স্থানীয় জনগণ ফাস্ট রেসপন্ডার হিসেবে কাজ করে তাই ৬২০০০ আরবান ভলান্টিয়ার তৈরীর কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৩৯০০০ ভলান্টিয়ার তৈরী করা হয়েছে।
- বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আধুনিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হচ্ছে। নিয়মিত উদ্ধার সামগ্রির পাশাপাশি অতিরিক্ত সর্বমোট ৫৭ সেট উদ্ধার সামগ্রি রিজার্ভ রাখা হয়েছে।
- ফায়ার সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে ঃ মডার্নাইজেশন অফ ফায়ার সার্ভিস

ও সিভিল ডিফেন্স প্রকল্প, এ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প, এয়ার ব্রিদিং এবং গ্যাস ফায়ার্ড ফায়ার ফাইটিং ট্রেনিং গ্যালারী প্রকল্প, ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প, ০৯টি বিশেষায়িত অগ্নি নির্বাপন ও উদ্ধার ইউনিট স্থাপন প্রকল্প, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং একাডেমী প্রকল্প, ঢাকা শহরে ০৭টি মডার্ণ ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প ইত্যাদি।

- ফায়ার স্টেশনের কাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে জাইকা, জাপান এর সহযোগিতায় পাইলট প্রকল্পের আওতায় তেজগাঁও ফায়ার স্টেশনকে রেট্রোফিটিং করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ঢাকা শহরের পুরাতন ফায়ার স্টেশনসমূহকে রেট্রোফিট করা হবে।
- স্ট্রিট হাইড্রেন্ট স্থাপনের জন্য ওয়াসাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
- অগ্নি দুর্ঘটনা ও দুর্যোগ প্রতিরোধে সকল পক্ষ যেমন ঃ DIFE, BUET, NTPAC, ACCORD, ALLIANCE, ILO, RAJUK, BGMEA, BKMEA সহ সকলের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে একসাথে সমন্বিত দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে।
- পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সম্প্রতি নতুন ২১৮টি ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টরের পদ নতুন করে সৃজন করা হয়েছে।
- জনসাধারণকে আরো উন্নত সেবা প্রদানের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে।
- পোশাক শ্রমিক তথা জনসাধারণের অধিকার জোরদারকরণে ফায়ার সার্ভিসে একটি হট লাইন স্থাপন করা হয়েছে। এই হট লাইনে (ফোন নং-০২-৯৫৫৫৫৫৫) যে কেউ ফোন করে যে কোন স্থানের অগ্নি ও অন্যান্য ঝুঁকি সম্পর্কে জানাতে পারেন এবং এ বিষয়ে তাৎক্ষনিকভাবে ফায়ার সার্ভিস থেকে টিম গিয়ে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে ঝুঁকি নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। উল্লেখ্য, সংবাদদাতার তথ্য গোপন রাখা হয়ে থাকে।
- শিল্পঘন এলাকায় ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা কম বিধায় স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ হিসেবে GIZ-Germany এর সাথে ফায়ার সার্ভিস যৌথভাবে Mini Fire Brigade স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে ফায়ার সার্ভিস ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভলান্টিয়ার একসাথে অগ্নি নির্বাপন করতে পারবে। এটি Public-Private Partnership এর একটি অনন্য উদাহারণ।
- অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরো জোরদারের জন্য Fire Service Rules সংশোধন করা হচ্ছে।
- আধুনিক অগ্নি নির্বাপন কৌশল সম্পর্কে অবগত থাকার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, পেশাজীবি সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রকার সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা হচ্ছে, যেমন ঃ Tokyo University of Science-Japan, Singapore Civil Defence Force, International Fire Chiefs' Association of Asia-Japan (IFCAA), International Search & Rescue Advisory Group (INSARAG) ইত্যাদি।
- শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অগ্নি-দুর্যোগ দুর্ঘটনার উপর দক্ষ পেশাজীবী তৈরীর জন্য ০২টি বিশেষ ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণ যেমন ঃ Fire Safety Manager Course, Fire Science & Occupational Safety Course আয়োজন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন প্রকল্প ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় আধুনিক অগ্নি নির্বাপন ও উদ্ধার সাজ-সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হচ্ছে।

কর্মক্ষেত্রে দুর্যোগ-দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয়

- ফায়ার সার্ভিস এর ফোন নাম্বার দৃশ্যমান স্থানে বড় বড় অক্ষরে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- অগ্নিকান্ড ও ভুমিকম্পে করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা ও মহড়ায় অংশগ্রহণ করা।
- মহড়া সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ করা এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় সংশোধনমুলক ব্যবস্থা

গ্রহণ করা।

- পর্যাপ্ত পানির ভুগর্ভস্থ জলাধার সংরক্ষণ করা ।
- ভবনের হাইড্রেন্টসহ সকল ফিক্সড ইন্সটলেশনে পানির প্রেসার বজায় রাখার জন্য ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক নির্দেশিত পানির পাম্প (ডিজেল পাম্প, জকি পাম্প) স্থাপন করা।
- শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের (যথা ঃ সরকার, মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক পক্ষের) সচেতনতা এবং সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।
- নিরাপদ বহির্গমনের জন্য ধোঁয়ামুক্ত সিঁড়ির ব্যবস্থা করতে হবে।
- গার্মেন্টস ও অন্যান্য বড় ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ক্লাস্টার ভিত্তিক ফায়ার স্টেশন/ওয়াটার টেন্ডার রাখা যেতে পারে।
- নির্দিস্ট সময় অন্তর অন্তর বৈদ্যুতিক সংযোগ, তার ও ফিটিংস পরীক্ষা করতে হবে।
- স্থায়ী অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থাদি যেমনঃ ফায়ার এলার্ম, ডিটেক্টরস, হাইড্রেন্ট, হোজ রীল, স্প্রীঙ্কলার, পিএ সিস্টেম ইত্যাদি নির্দিস্ট সময় অন্তর অন্তর পরীক্ষা করতে হবে এবং যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।
- ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি যেন দ্রুত দূর্ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারে সেজন্য রাস্তায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।
- বিএনবিসি এবং অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন আইন-২০০৩ এর শর্তসমূহ বাস্তবায়ন করা।
- ভবনে যথাযথ উপায়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
- প্রশিক্ষিত কর্মীদের মধ্য থেকে ফায়ার ফাইটার, উদ্ধারকারী, প্রাথমিক চিকিৎসা বাহিনী তৈরী করে দায়িত্ব বন্টন করা।
- ইভাকুয়েশন প্ল্যান এবং ফায়ার ফাইটিং প্ল্যান যথাযথস্থানে সংরক্ষণ করা এবং তদনুযায়ী মহড়া কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান ঝুঁকিপূর্ণ কেমিক্যাল ও অন্যান্য পদার্থ প্রশিক্ষিত কর্মী এবং যথাযথ উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবহার করা।
- শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সচেতনতামুলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- ঝুঁকিপুর্ণ ও প্রয়োজনীয় স্থানে ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
- জাতীয় পর্যায়ে সকল ক্ষেত্রে মহড়া অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে
- Business Continuity Plan আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে তৈরী করতে হবে এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- যেকোন দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় সরকারের প্রথম সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ভুমিকম্পসহ যে কোন দুর্যোগ ঝুঁকি বিবেচনাক্রমে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- প্রত্যেকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকি যাচাইপুর্বক (Risk Assessment) তদনুযায়ী প্রতিরোধমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- প্রত্যেকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিযুক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ঝুঁকিপুর্ণ ভবনসমুহ চিহ্নিত করা, সেগুলোকে রেট্রোফিটিং এর ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে অপসারণ করে নতুন ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা করা।
- দুর্যোগ-দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বিধি বিধানসমুহ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সংশোধন করা এবং হালনাগাদ করা।
- দুর্যোগ-দুর্ঘটনা পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা।
- বড় দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় সমন্বিত সাড়া প্রদানের জন্য National Emergency Operation Center

(NEOC) স্থাপন করা।

- দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে শহর এলাকাসহ সকলক্ষেত্রে নগর পরিকল্পনা (Urban Planning) বাস্তবায়ন করা।
- ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদি ক্ষেত্রে Auto Shutdown System চালু করা।

"প্রতিরোধ প্রতিকারের চেয়ে উত্তম", তাই আসুন আমরা সকলে মিলে অগ্নি দুর্যোগ দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রস্তুতি গ্রহণ করি এবং একটি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

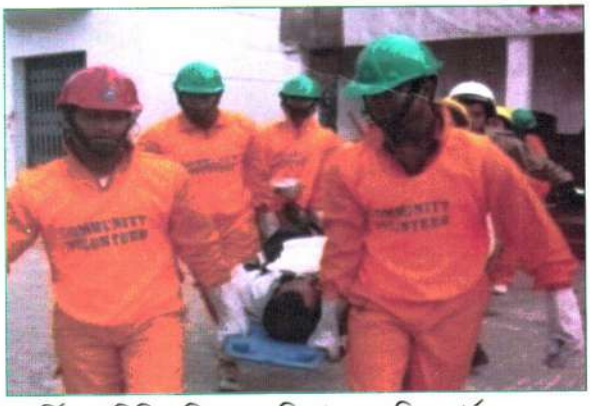

দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর-এর কিছু কার্যক্রম

শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে শ্রম পরিদপ্তর

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
শ্রম পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

উন্নত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ মানুষের মনস্তাত্ত্বিক সমর্থনের অন্যতম হাতিয়ার। কর্মস্থলে চাকুরির নিরাপত্তা, সম্মানজনকভাবে বাচাঁর জন্য উন্নত মজুরি ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হলে একজন কর্মীর মনস্তাত্ত্বিক আচরণ ও কাজের মান ভাল হয়। কর্মী নিজের মধ্যে লুক্কায়িত অফুরন্ত সম্ভাবনার সবটুকু সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে সক্ষম হয় ও প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করতে পারে। সেজন্য মানব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও টেকসই উন্নয়নের জন্য কর্মস্থলে শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করার আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

আর্ন্তাজাতিক শ্রম সংস্থা "শোভন কাজ" ধারণাটির উদ্ভাবক এবং বিশ্বব্যাপী শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টির এজেন্ডা বাস্তবায়নের অন্যতম রূপকার। আইএলও এর মহাপরিচালক Mr. Juan Somavia সর্বপ্রথম ১৯৯৯ সালে ৮৭তম আর্ন্তজাতিক শ্রম সম্মেলনে "শোভন কাজ" বিষয়টি উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর উপস্থাপনায় উৎপাদনশীল কাজ ও শ্রমজীবীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টির গুরুত্বকে চমৎকারভাবে তুলে ধরেন। শোভন কর্মপরিবেশ মূলত: এমন একটি কর্মপরিবেশকে নির্দেশ করে যাতে চারটি মৌলিক বিষয় অন্তর্ভূক্ত ঃ

(ক) কর্মস্থলে শ্রমজীবীর মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান,

(খ) কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;

(গ) সামাজিক নিরাপত্তা বিধান; এবং

(ঘ) সামাজিক সংলাপকে শক্তিশালীকরণ।

আর্ন্তজাতিক শ্রমমান নির্ধারণ ও রক্ষায় আই এল ও- এর প্রায় ১৯০টি কনভেনশন রয়েছে। এ কনভেনশনগুলোই শ্রমিক ও মালিকদের বিভিন্ন প্রকার অধিকারের মানদন্ড রক্ষা করে। ১৯৯৮ সালে অনুষ্ঠিত আই এল ও- এর শ্রম সম্মেলনে অসংখ্য কনভেনশনের মধ্য থেকে ০৮ টি কনভেনশনকে মৌল বা কোর কনভেনশন হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং বিশ্বের সকল সদস্য রাষ্ট্রের নিকট থেকে উক্ত কনভেনশনের স্বীকৃতি আদায় করা হয়। আই এল ও -এর ০৮টি মৌল কনভেনশন মূলত শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

মৌল কনভেনশন ও এর বিষয়বস্তু নিম্নরূপ

শ্রম আধিকারের বিষয়বস্তু	মৌল কনভেনশন সমূহ
সংগঠিত হবার স্বাধীনতা ও যৌথ দর কষাকষির অধিকারের কার্যকর স্বীকৃতি	কনভেনশন-৮৭ : সংগঠিত হবার স্বাধীনতা ও সংগঠন করার অধিকার কনভনশন-৯৮ : সংগঠিত হয়ে যৌথ দরকষাকষির অধিকার
সকল প্রকার বাধ্যতামূলক শ্রমের বিলোপসাধন	কনভেনশন-২৯ : বধ্যতামুলক শ্রম কনভেনশন-১০৫ : বাধ্যতামূলক শ্রমের বিলোপ সাধন
শিশু শ্রমের বিলোপসাধন	কনভেনশন-১৩৮: কাজের সর্বনিম্ন বয়স কনভেনশন-২৮২: খারাপ ধরনের কাজে শিশু শ্রমের বিলোপ সাধন
সকল পেশা ও কর্মে সকল প্রকার বৈষম্য রোধকরণ	কনভেনশন-১০০: কাজের সমমজুরি কনভেনশন-১১১: কর্ম ও পেশায় সকল প্রকার বৈষম্য রোধকরণ

কাজেই লক্ষ্যণীয় যে, শোভন কাজের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো কর্মস্থলে মালিক ও শ্রমিকের সংগঠিত হবার স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার। আই এল ও কনভেনশন ৮৭ এবং ৯৮তে এ অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আইএলও ত্রি-পক্ষীয়তার নীতিতে বিশ্বাসী সংস্থা। শ্রমক্ষেত্রের উন্নয়ন ও যে কোন সমস্যার ফলপ্রসু সমাধানে শ্রমিক, মালিক ও সরকার এ তিন পক্ষকে সমমর্যাদার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। সুতরাং শ্রমিক সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হবার সুযোগ না দেয়া হলে সমস্যা সমাধানে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে না। শিল্পক্ষেত্রের অন্যতম ষ্টেক হোল্ডার হিসেবে শিল্পের প্রতি শ্রমিকদের একাত্মতা ও প্রতিশ্রুতি আদায় করতে হলে তাদের সংগঠিত হবার সুযোগ বা মতামত দেবার স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে হবে।

শ্রমিকরা যখন কর্মস্থলে নিজেদের সমস্যা বা শিল্পের সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা ও মতামত দেবার সুযোগ পায়, তখন তারা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা নিয়ে ভাবতে শেখে। এর মাধ্যমে ভালো সমাধানের পথ খুলে যেতে পারে। মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও চুক্তির ফলশ্রুতিতে শিল্পে শান্তি ও স্থিতিশীল পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এপথ ধরে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন রচিত হয় এবং শিল্পের উন্নয়নে ও শ্রম আইন বাস্তবায়নে শ্রমিক ও মালিক ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে সক্ষম হয়।

সংগঠিত হবার স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার বাংলাদেশ শ্রম আইনের ত্রয়োদশ ও চতুর্দাংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। কর্মস্থলে শ্রমিক ও মালিকদের উক্ত অধিকার বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করছে শ্রম পরিদপ্তর। শিল্প কলকারখানায় শ্রমিক ও মালিকরা যাতে সু-শৃঙ্খলভাবে সংগঠন করতে পারে ও নিজেদের সমস্যা নিজেরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অথবা শ্রম পরিদপ্তরের সালিসি কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাধান করতে পারে সে লক্ষ্যে শ্রম পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নিবেদিত হয়ে কাজ করছে।

শোভন কাজের আরেকটি নিয়ামক হলো সামাজিক সংলাপকে শক্তিশালীকরণ। আই এল ও এর মতে, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও শিল্প সমস্যার সমাধানে সোশ্যাল ডায়লগকে শক্তিশালী করতে হবে। বাংলাদেশ শ্রম আইনের ২০৫ নং ধারায় সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে "অংশগ্রহণকারী কমিটি" গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যাতে এ অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠিত হতে পারে এবং কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান ও সংলাপের মাধমে যাতে শিল্প সমস্যার সমাধান হতে পারে তা মনিটর ও নিরীক্ষণ করেছে শ্রম পরিদপ্তর।

বাংলাদেশ চলমান পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের একটি অংশ। এ প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভুমিকা রাখার মাধমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হবে। সে ক্ষেত্রে কর্মক্ষম, দক্ষ ও ইতিবাচক মানসিকতা সম্পন্ন মানব সম্পদের কোন বিকল্প নেই। একমাত্র প্রশিক্ষিত কর্মীদলই উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। শ্রম পরিদপ্তরের রয়েছে ৪টি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, যার নাম "শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন"। এ শিক্ষায়তনের মাধ্যমে নিয়মিত ও অব্যাহতভাবে বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে শ্রমিক/ শ্রমিক প্রতিনিধি, মালিক/ মালিক প্রতিনিধিদের দক্ষ ও সচেতন করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মালিক ও শ্রমিকগণ শ্রম আইন বাস্তবায়নে ও শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টির প্রতি সচেতন ও দায়িত্বশীল হয়ে উঠছেন। তাছাড়া শ্রম পরিদপ্তরের ৩০টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অর্ন্তভুক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে :

শিল্প সম্পর্ক,শ্রম প্রশাসন, উৎপাদনশীলতা, আই,এল,ও এর কনভেনশন, শ্রম আইনের বিভিন্ন বিষয় যেমন- নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলী, মজুরি পরিশোধ সংক্রান্ত বিধানাবলী, কর্মঘন্টা ও ছুটি সংক্রান্ত বিধান, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধান, প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা, দূর্ঘটনাজনিত কারণে জখমের জন্য শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের বিধান, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন রেজি:, যৌথ দরকষাকষি নির্ধারণ ও কার্যক্রম, শিল্প বিরোধ উত্থাপন ও মীমাংসার আইনগত পদ্ধতি, অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন ও কার্যক্রম , শ্রম আদালত ও আপীল ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি।

শোভন কাজ নিশ্চিত করার জন্য শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও সুষ্ঠু পরিবার পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা সুস্থদেহ, সুস্থমন ও সুস্থ পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছাড়া শ্রমিকদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্বপালন সম্ভব নয়। সেজন্য শ্রম পরিদপ্তর বাংলাদেশের শ্রমিক সমাজের জন্য শিল্পঘন এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেছে ৩০টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিকের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, চিত্তবিনোদন সেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রশিক্ষণ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে এসব সেবা শ্রমিক ও তার পরিবারকে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পার্লামেন্টারি ডেলিগেটদের সঙ্গে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মত বিনিময়

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার গুরুত্ব

সালাহউদ্দীন কাসেম খান
সভাপতি
বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন

আধুনিক যন্ত্রযুগে পেশাগত দুর্ঘটনা ও ব্যাধি মানবজাতির জন্য এক শোকাবহ ব্যাপার এবং মর্মান্তিক ঘটনা, শুধু তাই নয় এটা এক প্রকার অর্থনৈতিক নিষ্ফলতা, ক্ষতি বা অপচয়। দুর্ঘটনার কারণে শ্রমজীবী মানুষের মৃত্যু হ'লে সে পরিবারের বিরাট ক্ষতি হয়ে থাকে। পারিবারিক ও মানসিকভাবে সে পরিবার অপূরণীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এছাড়া উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, উৎপাদনের প্রক্রিয়া বিচ্ছিন্ন ও ব্যাহত হয় এবং উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি নিদারুণ বিপর্যয় ও ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বর্তমান বিশ্বে কল-কারখানা ও কর্মপরিসরে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারখানায় রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রমে দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে শ্রমজীবী মানুষের শ্রম যেমন অপরিহার্য, অর্থ ও পুঁজির যোগান দেওয়া তেমনি অপরিহার্য। অন্যথা কোনো দ্রব্য উৎপন্ন হবে না। এ উৎপন্ন প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন দ্রব্যাদি উৎপন্নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ফলে বাড়ছে বিভিন্ন রকম ঝুঁকি, আসন্ন হুমকি ও বিপদ। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ১৯৮৪ সালে এ উপমহাদেশে ভারতের ভুপালে ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানায় মর্মান্তিক বিস্ফোরণ বিশ্বকে হতভম্ব করেছে। বাংলাদেশেও কারখানা বিধ্বংস ও বিনাশ হয়ে থাকে ফলে শ্রমজীবী মানুষের মৃত্যু, পঙ্গুত্ব, রোগাক্রান্ত, পরিবারের বিপর্যয় ডেকে আনে। এতে ক্ষতিপূরণ দিয়ে সমস্যার সমাধান হয় না; অর্থনৈতিকভাবে দেশ চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এছাড়া রাসায়নিক কারখানাগুলো বিস্ফোরণের হুমকি শুধু নয়; এসব কারখানা হতে বিষাক্ত ধোঁয়া, গ্যাস, বাষ্প, রাসায়নিক দ্রব্য, আবর্জনা ইত্যাদি নির্গমন ও নিঃসৃত হয়ে শ্রমজীবী মানুষের জীবন যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি হচ্ছে পরিবেশ দূষণের মাধ্যমে সমাজ জীবন নিরাপত্তাহীন। প্রত্যেকটি রাসায়নিক পদার্থই মানবদেহের জন্য প্রচ্ছন্ন হুমকি।

উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। বিভিন্ন কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হলে মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। বেকারত্ব বা কর্মহীনতা জাতির জন্য দূর্ভাগ্য। সুতরাং, কারখানা প্রতিষ্ঠা করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, বেকারত্ব দূর করা, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা, এসব প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এসব প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন করতে গিয়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রশ্ন দেখা দেয়। শ্রমজীবী মানুষের কার্যক্ষেত্রে নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা যেমন প্রয়োজন, শ্রমজীবী মানুষের নিরাপত্তা বিধান করা তদ্রুপ প্রয়োজন। কারণ সুস্থ ও সবল শ্রমিক উৎপাদনশীল শ্রম দিতে পারে। অসুস্থ শ্রমিক উৎপাদনশীল শ্রম দিতে পারে না। কাজেই কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক যেনো সুস্থ ও নিরোগ থাকে সেদিকে কর্তৃপক্ষকে বিশেষ নজর দেওয়া অপরিহার্য।

স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধান শ্রমিক বা মালিকের একক দায়িত্ব নয়। বিষয়টি কেবল আইনের মাধ্যমে সম্ভব নয়। সরকার, মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক সংগঠন, সেইফটি কমিটি সকলের সার্বিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তাপূর্ণ কর্মপ্রণালী নিশ্চিত করতে হবে। এর সাথে সকল পক্ষের মন-মানসিকতা পরিবর্তনের মাধ্যমে উপযোগী করে তুলতে হবে। তবেই অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

কর্মপরিবেশে সকল পক্ষ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রশিক্ষিত হতে হবে। প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে জাতীয় অর্থনীতির কল্যাণে ও জাতীয় স্বার্থে কর্মপরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সচেতন থাকা অপরিহার্য। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটলে, কেবল শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় না; মালিকও ক্ষতিগ্রস্ত হয় তথা রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়। কর্মপরিবেশ সুন্দর হোক, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ হোক, উৎপাদন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হোক-এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

একটি কমপ্লায়েন্স কারখানায় অগ্নি নির্বাপন মহড়া

একটি কমপ্লায়েন্স কারখানায় অগ্নি নির্বাপন মহড়া

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বাস্তবায়নে তৈরী পোশাক শিল্প মালিক সংগঠনের উদ্যোগ, অগ্রগতি ও পরিকল্পনা

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
সভাপতি, বিজিএমইএ

বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের সর্ববৃহৎ সংগঠন বিজিএমইএ ১৯৮৩ সালে যাত্রা শুরু করে। এখন এর পরিধি অনেক ব্যাপক। বিজিএমইএ সর্বদা শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য শ্রম আইন, শ্রমনীতি, আই.এল.ও কনভেশন বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে বিজিএমইএ-এর সকল সম্মানিত সদস্যদের তা বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বাস্তবায়নে বিষয়টিও অন্যতম।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পরিবেশ সুরক্ষাসহ উৎপাদন ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশ একটি দ্রুত উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে শিল্প ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হচ্ছে। সেসঙ্গে শিল্প ও কলকারখানাসহ বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সম্মিলিত আন্তরিক প্রয়াস প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রধান স্টেকহোল্ডার্স উদ্যোক্তা এবং শ্রমিক। উভয়ই পারস্পরিক সুবিধাভোগী। শ্রমিকের শ্রমের ওপর উদ্যোক্তাদের ব্যবসা নির্ভরশীল। আবার অন্যদিকে উদ্যোক্তাদের ব্যবসার সঙ্গে শ্রমিকের জীবন ও জীবিকা সম্পৃক্ত। কাজেই নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার পর্যায়ে Healthy work place, Decent work I Green job নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মুক্তবাজারভিত্তিক বিশ্ব অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশীয় শিল্পসমূহের স্থানীয় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরী। আর এ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে জড়িত রয়েছে উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহার এবং দক্ষ শ্রমশক্তির সাথে কর্মস্থলের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ। কাজেই কর্মস্থলের নিরাপদ পরিবেশ ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সব ধরনের আইন ও পরিবেশগত উদ্যোগ, বিনিয়োগ একান্ত আবশ্যক এবং তা সকলের জন্যই কল্যাণকর।

বিজিএমইএ এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, আইএলও ও শ্রমিক সংগঠনের সাথে সমন্বয় সাধনপূর্বক কাজ করে থাকে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিজিএমইএ শ্রম সেল, ফায়ার সেফটি সেল, স্বাস্থ্য সেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য সেল গঠন করে কাজ করছে যা একটি চলমান প্রক্রিয়া।

শ্রম শাখার মাধ্যমে শ্রম আইন ও শিল্প সম্পর্ক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রশিক্ষণে কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, ট্রেড ইউনিয়ন, অংশগ্রহণকারী কমিটির সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। এ পর্যন্ত ৪৯১টি কারখানার ১১৭০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যা চলমান রয়েছে। আইএলও আইটিসি সহযোগিতায় বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ Essentials of Occupational Safety and Health (EOSH) বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ প্রশিক্ষণের প্রধান লক্ষ্য কারখানা পর্যায়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি চর্চা গড়ে তোলা। এ কার্যক্রম ২০১৪ সালে শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ'র ১১৪ জন সিনিয়র মাস্টার ট্রেনারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সিনিয়র মাস্টার ট্রেনারগণ ৪৮৫টি কারখানার ৮০৩৮ জন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা/ সুপারভাইজারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। উক্ত প্রশিক্ষণ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে সর্বমোট ৮ লক্ষ শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। আশাকরি উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আগামী জুন, ২০১৭ মাসে শেষ হবে। এছাড়াও উল্লেখিত ৫৮৫ টি কারখানার কর্মকর্তাগণকে "সেইফটি কমিটি গঠন ও এর কার্যক্রম" সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

বিজিএমইএ সেইফটি সেলের মাধ্যমে পোশাক কারখানার শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণকে "অগ্নি-নিরাপত্তা, নিরাপদ বহিঃর্গমন ও প্রাথমিক চিকিৎসা" সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত ২৫২৬টি কারখানার ১,১২,৫০৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চলতি বছর কারখানা পরিদর্শন ও ফায়ার ড্রিল প্রোগ্রামের আওতায় এপর্যন্ত ৯৭৮টি কারখানা পরিদর্শন এবং ৩২১টি মহড়া পরিচালনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও ক্র্যাশ প্রোগ্রামের আওতায় কারখানার মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে ৯২টি প্রশিক্ষণে ২৩৪২টি কারখানার ২০,১৮৮ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বিজিএমইএ ফায়ার সেলের মাধ্যমে ভূমিকম্প সতর্কতামূলক প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৬ সালে শুরু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৮টি কারখানায় ১৫১২ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

বিজিএমইএ স্বাস্থ্য সেলের অধীনে প্রত্যেক কারখানায় স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়াও বিজিএমইএ-এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় ১২টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিক ও তার পরিবারবর্গকে বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহসহ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ বাবদ বিজিএমইএ থেকে প্রতিমাসে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। বিজিএমইএ স্বাস্থ্য সেলের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২৮৫০ জন টিবি রুগীকে সুস্থ করে তোলা হয়েছে, যার ব্যয়ভার বিজিএমইএ বহন করেছে। এ ছাড়াও টিবি রোগের সতর্কতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

বিজিএমইএ ইন্স্যুরেন্স শাখার মাধ্যমে ২০০২ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৪,৮৩৪ জনকে ৬৬ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। যা একটি চলমান প্রক্রিয়া।

ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার মাধ্যমে নিয়মিত কারখানা ভবন পরিদর্শনের কাজ অব্যাহত রয়েছে। কোন কারখানা মালিককে বিজিএমইএ-এর সদস্যভুক্ত করার পূর্বে ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা কর্তৃক প্রতিবেদন পাওয়ার পর মেম্বারশীপ প্রদান করা হয়ে থাকে। সর্বোপরি বিজিএমইএ National Action plan এর আওতায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের বৈশ্বিক, নৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতার আলোকে নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটির বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়টি বাস্তবায়িত হলে কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিসহ জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং শিল্পসমুহের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। সে সাথে জাতীয় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক হবে। দেশ তথা জাতি সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে। বিজিএমইএ এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে তৈরী পোশাকখাত থেকে ৫০ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানির লক্ষমাত্রা অর্জনের যে পরিকল্পনা বিজিএমইএ গ্রহণ করেছে তা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সব ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান হচ্ছে। সবশেষে বিজিএমইএ'র একটি শ্লোগান "BGMEA is commited to ensuring Dignity, Wellbeing & Safety of workers" দিয়ে শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

Preventive Healthcare Solution to Improve Occupational Health and Wellness at Workplaces in Bangladesh

Md. Anwar Ullah, FCMA, Ph.D*
Khondaker Abdullah-Al-Mamun, Ph.D**

Ensuring Occupational Health and Safety (OSH) in all workplaces, especially in ready-made garment (RMG) industry, is one of the big challenges of Bangladesh and has to deal it with today and in the coming years to achieve higher GDP growth and economic sustainability. Bangladesh is not only wants to reach the middle income country status by 2021 triggering her economic growth and improvement of overall employment scenario, but also to attain Sustainable Development Goals (SDGs) with special emphasis on decent work and good health and well-being for all employees. Both local and global commitments are needed in working together in this regard. In line with this idea it is evident that labour productivity in developing regions of the world has shown significant growth in the recent years. Despite this rapid growth, the rate of labour productivity of those regions in comparison to developed countries remained substantially low. In developing countries like Bangladesh, labour productivity is being greatly affected by different health factors. Access to proper clinical care and better physical environment has to take into account if Bangladesh wants to ensure Occupational Health and Safety in RMG industry which is one of the most vibrant export-oriented and revenue generating business sectors for the country.

In Bangladesh, about 85% of the workers currently working in the RMG factories are women. More importantly, women are very vulnerable when it comes to Occupational Health and Safety. Visits, inspections and several studies reveal that workers in RMG factories suffers from various diseases and health complications due to chronic exposure to hazardous materials or absence of proper biological monitoring and healthcare, that includes, anemia, malnutrition, gastric pain, abdomen pain, fatigue, fever, common cold, problems in bones, back pain, eye strain, headache, pruritus, jaundice, dermatitis, helminthiasis, respiratory problems, etc. In response very little has been done regarding routine biological monitoring and proper healthcare for the workers. In the current scenario, Occupational Health and Safety is more focused on removal of dangerous substances, compulsory distribution and use of Personal Protective Equipment (PPE). Yet when it comes to health, it is not only about safeguarding people from critical injuries or chemical exposure.

According to World Health Organization (WHO) health is more than just the absence of disease rather it is a state of complete physical, mental and social well-being. There is a saying that, prevention is better than cure. If a disease can be ward off by taking preventive measures, it is more effective than dealing with health complications those already have reached to a critical stage. To achieve well-being of the workers, preventive measures to deal with Occupational Health and Safety should have two focus points, one is removal of hazardous chemical substances and mandatory use of PPE, and the other one would be routine health monitoring

through preventive healthcare. Preventive healthcare is vital for maintaining a healthy lifestyle by lowering the health risks connected with Non-communicable Diseases (NCDs). Only healthy workers can offer better performance and higher productivity rate and there is no other way around.

Speaking of NCDs, the non-communicable diseases have a great impact on mortality and morbidity rate worldwide and prevention of NCDs in developing countries like Bangladesh is essential to achieve sustainability in the long run. NCDs are account for 65% of global deaths. In low and middle income counties the percentage of NCD deaths rises up to 80% which is very alarming and needs immediate attention to measure and strong work plan. On the other hand, NCDs have direct impact on public health which is affecting productivity of the people; sometimes it leads to partial or complete disability or even death. It is not only a matter of health, because it is significantly affecting a country's GDP and overall economic growth. With a preventive healthcare solution, deaths and complete or partial disabilities due to NCDs could be averted effectively. In Bangladesh, the concept of automated or remote health monitoring devices and its services are very new. The current level of awareness looks promising in terms of health concerns. More people are buying digital machines or devices such as, blood pressure machine, glucose monitoring device, weight machine, etc. for their personal use to monitor different health risks (e.g.-hypertension, cardiovascular diseases, diabetes, obesity, etc.).

In Bangladesh, healthcare facilities have made a noteworthy improvement and progress in the recent years. The capacity to provide healthcare has doubled in the last two decades, more healthcare centers, hospitals and health complexes, were built and more physicians were appointed. But, there is also a catch. In a country like Bangladesh with a vast number of people living below the poverty line, the reliance on the public health sector for treatment and medical advice at affordable costs is considerably high. Because, in private health sector the direct medical cost, which includes costs of outpatient visits, laboratory tests, medicines, and other medical services and direct non-medical cost, including transportation expenses, food on the way to the hospital and other personal maintenance service expenses needed to bear by the patients and their attendants is very high and it is increasing rapidly day by day. On the other hand, the medical facilities and infrastructure available in RMG factories is very negligible. Available medical facilities inside the factories lack of essential manpower, adequate supply of medicine and basic medical equipment. In these circumstances, preventive healthcare service at affordable cost deserves a far greater emphasis when we are limited by scarcity of necessary resources but at the same time we are looking for a satisfactory improvement in the entire heath sector.

People in Bangladesh spend around Tk. 600 crore for blood pressure and blood glucose monitoring per year. Unfortunately, the monitoring system is not very effective. When people measure different health parameters, they normally do not store those data for future use. When they suffer from any health complications they go through thorough diagnosis and medical checkups as they do not have any previous health records. The total procedure becomes time-consuming and results in low success rate in treatment and recovery. This scenario is

very common for the people living in the urban or rural areas and workers in different factories all over the country. Lives of people who live in the cities or belong to a better income class can easily afford available healthcare services but the people who are living in the remote areas or who are involved in manual labor and low-paying jobs like factory workers cannot afford it. At the same time, health awareness among workers or low-income class in Bangladesh is considerably low. Considering all different aspects *CMED, a cloud based affordable preventive healthcare service model,* is a very effective solution to preventive healthcare that offers cheap yet viable smart health monitoring services to that vulnerable population of the country. It also analyzes the data to generate health reports of the patients and notifies them about any possible health risks they might face if necessary precaution is not taken. It also records those data in the cloud server for future use if they need to go to the doctors for further diagnosis and treatment, those health records will come in handy in the process.

CMED Health has already introduced *Workforce Wellness Program (WWP)* to ensure better health for the workers at affordable cost with the help of available technology. CMED is a cloud based intelligent health services network comprises of different health solutions for different types of diseases. It is also called preventive healthcare service which allows a person to know about his/her current health status that s/he can identify through measurement of various health parameters like, Blood Pressure, Blood Glucose, Pulse, Blood Oxygen Saturation (SpO2), Body Temperature, Weight, Height and Body Mass Index (BMI) to avoid health risks and non-communicable diseases like, hypertension, heart diseases, cardiovascular diseases, diabetes, fever, obesity. WWP of CMED Health Services are provided through a Smart Health Monitoring Kit. The kit comes with smart medical devices, like- BP & Pulse Monitor, Glucometer, Pulse Oximeter (SpO2), Thermometer, Height Scale, Weight Scale, Smart Tab. CMED also comes with services, like- Blood Typing/Grouping, Printed Health Report having information regarding health status with relevant data, Cloud Server for on-site data recording and Doctor on Demand.

In short time, the response CMED received from the workers is very remarkable. The workers who received WWP preventive healthcare service from CMED really liked the initiative and simple method of health monitoring. They seemed very enthusiastic during the service; they even expressed a feeling that they would pay for this kind of service themselves if the factory owners or the management do not allow any medical allowance to bear the cost of CMED's services. CMED Health till date served 2155 workers through its *Workforce Wellness Program (WWP)* in 8 RMG factories. The overall scenario of current health condition of the factory staffs and workers is very staggering according to the health status reports generated by CMED Health based on 8 health parameters or vital signs. The statistics presented in figure obtained from those reports warrant a timely measure to ensure proper and regular health monitoring of the workers to avert severe health complications.

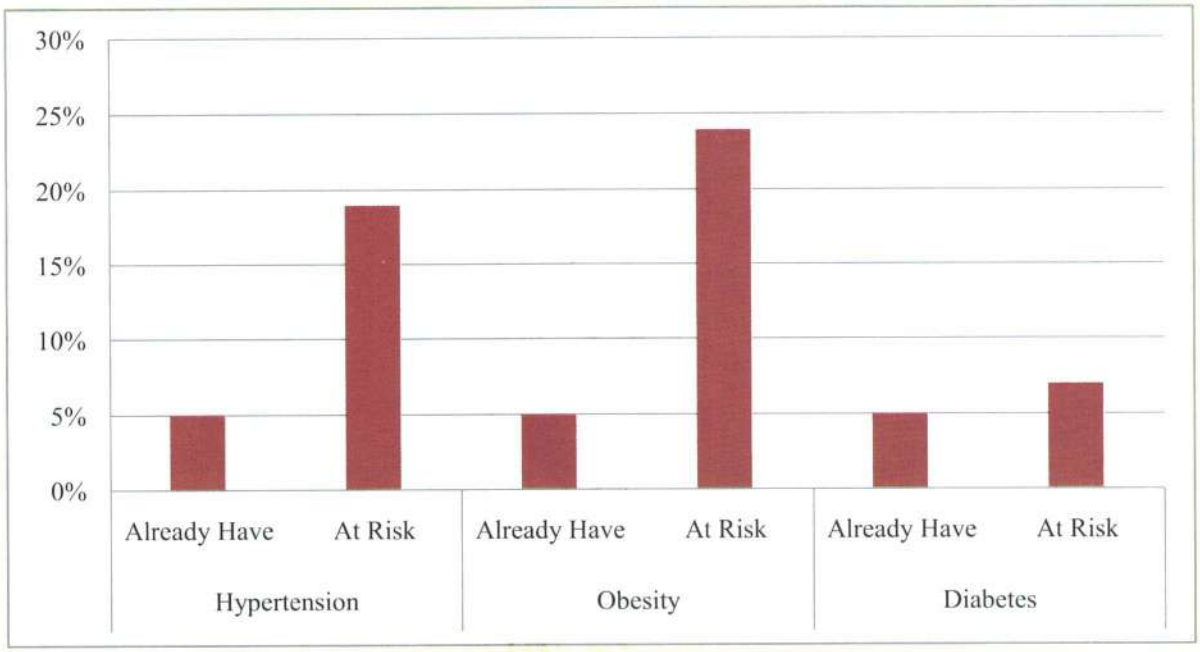

Figure 1: Current health statistics on CMED WWP service clients (mostly RMG executivs and workers

Factory workers in Bangladesh are not able to maintain any of the health conditions prescribed by the World Health Organization (WHO). After experiencing tragic incidents like Rana Plaza collapse or fire break out at Tazreen Fashion factory the government of Bangladesh has taken various steps towards improving the safety measures in factory buildings including both Active fire protection (AFP) and Passive fire protection (PFP) systems in all workplaces to make the environment more secure, but a many other measures yet to be done to preserve worker rights. In National Occupational Health and Safety policy 2013, factory owners are bound to ensure a healthy and safe workplace for the workers. Since then, we have seen infrastructural improvement in those factories, but about health, change of scenario is not substantial; which is a kind of violation of workers' rights. Their health conditions are being affected by many non-communicable diseases which can be obviated through a preventive healthcare solution.

In CMED's first three months WWP service statistics in RMG factories is shown in figure 1 and it has been found that about 5% of the workers have already developed hypertension and about 19% of the workers are on the way of developing hypertension; about 5% of the workers have already developed obesity and about 24% of the workers are on the way of developing obesity; and about 5% of the workers have already developed diabetes and about 7% of the workers are on the way of developing diabetes. It is also observed that about 7-24%of workers are at risk of developing hypertension, obesity or diabetes, which they are totally unaware of. There are more health risks that those workers might encounter in the coming days where only preventive health monitoring can keep their health status on the right track. A study conducted in the USA shown that, if an organization provides preventive healthcare service like WWP to

their employees or workers, it will cause 227% reduction of medical cost and 137% reduction of employee absenteeism. Another study suggests that, monitoring individual's health vitals in regular basis can reduce the health risks up to 5 times. All things considered, it is evident that regular health monitoring is essential for maintaining healthy and pro-active lifestyle by keeping our valuable manpower safe from various health risks, and to achieve that the cost will be nominal as well.

CMED is a platform where medical science and technology will converge. With the help of improved software architecture and quality medical sensors, preventive healthcare service can now be provided with portable devices and easy connectivity. Because of a preventive healthcare solution like CMED, everything will be at people's fingertips with a very few cost which is less or equal to one dollar in an average. Preventive healthcare will be just one-click away. Technological advancement and improved telecommunication system have made the convergence of health and technology possible which will take us way further ahead toward building up a health aware population at home and in workplaces all around the country. The idea and belief CMED Health stands for will not only bring socio-economic change to the country, but also it will have a positive impact on people's mind. People will go through a psychological and behavioral change, and they will become more careful about their health as monitoring health would be a simple thing to do; keeping regular health records and maintaining a healthy lifestyle would become a trend. *"Monitor Your Health, Stay Healthy"* should be a slogan that we all need to put emphasis on towards achieving a healthy and progressive nation.

*Additional Inspector General, Department of Inspection for Factories and Establishment, Ministry of Labour and Employment, Government of Bangladesh.

**Associate Professor, Department of Computer Science and Engineering and Director, AIMS Lab, United International University, Dhaka, Bangladesh.

A worker's health test is being done

Occupational Health and Safety: Perspective of Shipbreaking Industry in Bangladesh

ABM Sirajul Haq
Deputy Secretary

Breaking structure of the ship or emission of wastage and procedure of cutting different parts of the ship is ship breaking. It is done in the beach, dry-dock of anywhere specially at beside the sea or river. The iron sheet which we get from the ship breaking industry is used in re-rolling mills and the steel mills of the country as raw materials. The 90% demand of iron and steel is met from this industry in our country. So, sometimes it is called 'floating iron mine'. Furthermore, the other materials as engine, generator, boiler, electric materials, furniture, refrigerator, air conditioner etc. has a good market in our country. Using the iron getting from the ship breaking we make MS Rod, MS Bar, and angel, steel sheet to meet up the demand of local market. Engines and generators are used in garment industry, boilers are used in rice mills, garment washing plants, knitting plants and in similar other industries. Other materials are used in different works. Because of the increasing demand of steel, it has a large growing market in Bangladesh. Though ship breaking is demanding industry, the health hazards and other issues are coming forward for the workers who are involved in ship breaking.

Emergence of ship breaking business:

Generally ship is made of 95% mild steel, 2% stainless steel and 3% mixture of different materials. According to the international Maritime Organization (IMO) the maximum lifetime of a ship is 29 years. But the life time is normally 20 years and it may be extended by repairing with standard maintenance is 25 years. According to the "Loyeds Shipping Register" there are 50000 mother vessels in addition to the Frigate and every year about 700 ships come under breaking. According to Basel Convention (The Basel convention on the trans boundary movement of hazards waste and their disposal) no country is allowed to unused ship to other country for disposal without making it waste free and as it is more expensive, so many country who were not so aware they started ship breaking business as South Korea, China, Taiwan etc. Now Taiwan closed this business though in the 1980's it was no.1 in this business. In the early 1990 Turkey, China, Pakistan. India, Philippines, Vietnam etc. countries started this business. In the meantime Pakistan, India and Bangladesh started this because of chief labour, lack of law and huge demand of steel. During this time China and Turkey started ship breaking in scientific way considering the safe environment and also doing research on that. During this time Pakistan, India and Bangladesh earned a lot of money from this industry. But it loses many lives due to accident which creates criticism of the world. During this time India created Guzrat Maritime Board (GMB) for surveillance of the work, Workers Welfare, Hazards assessment, Hazardous ambient factor, Dumping management system and it added a new momentum to the ship breaking activities. It is reported that from January 2016 to March 2017 nineteen people lost their lives due to accident who were working in the ship breaking yards in Bangladesh. During this period number of the injured people was 12.

History of Ship Breaking in Bangladesh:

After 1980, ship breaking industry got momentum in Bangladesh. The owner of Steel House Mr. Shafi, Mr. Hatem, Mr. Junnu and Mr. Suja started this business in 1964 as breaking the scrap. In 1974 Karnophuli Metal Works and in the year 1982 some people started this business

on the bank of sea under Sitakundu area. Now about 52 units are working there for ship breaking. In 1990's the number was 84 though in papers it was 113. Whole time of the year ship breaking work is being done. Now there are about 70 Commercial Enterprises are engaged in this industry registered under Company Act 1913. 150 Ship Yards are licensed by DIFE as factory.

Kind of Ships:

Now about 50000 ships are moving all over the world. There are many kinds of Ships in the worlds for various usages as: Tanker, Passenger Ship, Container Ship, Bulk Carriers, Chemical tankers, General Cargo, L.N.G.L.P.G and others.

Ship Import, Beaching and the Procedure of Breaking:

The scraped ships are sold in the International markets. There are markets in Singapore, Britain and Dubai to sale the scraped ships. Bangladesh imports about 150-200 scraped ships every year through local agents. On behalf of the seller the agent have to supply the ships to the buyers within 72 hours after reaching the ships to the outrage of the sea having all the required papers.

Procedure of Ship Breaking:

1. Beaching Procedure
2. Barth Procedure
3. Block Procedure
4. High-tech Procedure

Role of Ship Breaking Industry in Economy:

The business of ship breaking is as like dead elephant of lac Taka, that nothing is gone to wastage. Centering the ship breaking industry many businesses are established surrounding the area of Sitakundu. It means saodagars (business group) are created there. The whole parts/body of the ships and other materials are contributing to the economy of the country. But the ship breaking is one of the most dangerous occupations. It incurs high level of fatalities, injuries and work-related diseases. Ship breaking is a difficult process due to the structural complexity of the ships. It generates many environmental, safety and health hazards. Workers usually lack personal protective equipments and have little training. Inadequate safety controls, badly monitored work operations and high risk of explosions create very dangerous work situations. Workers have very limited access to health services and inadequate housing, welfare and sanitary facilities further exacerbate the plight of the workers.

Ninety percent of ship-breaking in the world is carried out in Bangladesh, China, India, Pakistan and Turkey. The recycling of ship takes place at several sites along the coast of Bangladesh. The area of Fauzdarhat, a 16-km beach south-west of Chittagong, is the most significant and in fact the second largest ship-breaking site in the world in respect of number of vessels being scrapped.

Ship recycling poses a great number of hazards such as- bright light, fire, dust, oxyacetylene, welding, smoking, asbestos dust, chromates, iso-cyanide gas, volatiles, fire, toxic metal, oil, TBT, PCB, excessive work load, long working hour, monotonous work etc. Therefore, a number of occupational accidents and diseases occur. Eye problems such as- redness, tearing,

burning sensation, blurring vision, blindness etc are seen. Respiratory problems such as- respiratory distress, asthma, pneumonia, cough, sputum, chest-pain etc are also common. Moreover, other problems like abdominal problems, urinary problems, muscle problem, skin problem etc are also observed. Considering all the serious hazards and its consequences, ship breaking has been included in the list of serious hazardous work 2013 gazetted by the government.

Ship breaking is a highly polluting industry. Large amounts of carcinogens and toxic substances (PCBs, PVCs, PAHs, TBT, mercury, lead, isocyanides, sulfuric acid) not only intoxicate workers but are also dumped into the soil and coastal waters. An average size ship contains up to 7 tones of asbestos which is often sold in the local communities after scrapping. As the majority of yards have no waste management systems or facilities to prevent pollution, ship breaking takes an enormous toll on the surrounding environment, the local communities, fishery, agriculture, flora and fauna. This naturally causes serious environmental damage with long-term effects for occupational, public and environmental health.

Considering all the health and environmental hazards and also to ensure the Safe and environmentally sound ship recycling in Bangladesh, the government enacted the "The Ship Breaking and Recycling Rules, 2011for this sector. It has been formulated in pursuance of the Hon'ble High Court Division of Supreme Court, in writ petition No. 7260 of 2008 dated May 24, 2011 taking into consideration the directions contained in the order. It incorporates everything relating with ship breaking in detailed.

Bangladesh Labour Act 2006 (BLA) is the core law that has many sections for the workers' welfare, safety and health in Bangladesh. It has a much wider scope having some sections that deal with the OSH. It covers all workers employed in any establishments such as- factory, shop, commercial establishment, industrial establishment etc. So, The Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) under the ministry of Labour and Employment has been inspecting the ship recycling yard to Safe and Environmentally Sound Ship Recycling in Bangladesh. From DIFE, so far about 150 ship breaking yards have taken factory license. But at present about 52 ship breaking yards are active now.

The factory inspectors of DIFE are given the power in the Act to require employers to take specified action. The health, safety and welfare duties required of 'establishments' are set out in chapters 5, 6, 7 and 8 of the BLA 2006. National policy for occupational safety and health 2013 is another landmark that guides and motivates us to create our workplace safer. A recently adopted Bangladesh labour Rules 2015 has extensive set of provisions for creating safe and sound working condition.

In the Bangladesh Labour Act 2006 (amended in 2013) , the article no. 5 says that no employer shall employ any worker without giving such worker a letter of appointment and every such employed worker shall be provided with an identity card with photograph. The article no 17.22 (1) and (2) of the Ship Breaking and Recycling Rules, 2011 also refers to the BLA 2006 in this connection by saying- (i) An attendance register of workers working on the yard is maintained in accordance with the provisions of Labor Act 2006, rules made there under and that the workers are issued identity cards in accordance with the relevant rules. (ii) Identity card to the workers shall be issued by the ship recyclers in an approved manner and ship recyclers will maintain proper records of the entry and exit of the workers.

There are different sections and rules in the BLA 2006 and the Bangladesh labour Rules 2015 on Dust and Fume (sec. 52), Disposal of wastes (sec. 54), Precautions in case of fire (sec. 62), Excessive weights (sec. 74), eye protection (sec. 75), Dangerous fumes (sec. 77), Explosive or inflammable dust and gas (sec. 78), Drinking Water (sec. 58), Latrines and Urinals (sec. 59), First aid appliances (sec. 89), Safety Record Book (sec. 90), Washing facilities (sec. 91), Rest room (sec. 93) etc. In BLA 2006, there is a chapter (9th) titled as 'working hour and leave'. The 12th chapter of BLA 2006 and its 1st and 5th schedule deal with the compensation in case of occupational accidents and diseases.

But what we see in a ship recycling yard is the lack of requirement directed in the BLA 2006. Gas cutters and their helpers cut steel plates continually without eye protection, uniform, protective gloves or boots. Workers carry weights far above the limit prescribed in local regulations. Enclosed spaces of the ship are not properly cleaned prior to beaching and may contain dangerous chemicals or fumes. Workers enter, unaware of the hazards, and consequently suffer from suffocation, injuries to the lungs, and so on. Some spaces may also contain explosive gases, and when the gas cutters drill holes or by other means try to release these, severe explosions and fires can sometimes occur. Drinking water for the workers is extracted from tube-wells that are sunk in each ship breaking yard. Rest-room facilities for the workers are not provided.

If the provisions of the BLA 2006 and the Bangladesh labour Rules 2015 are followed strictly, occupational accidents and diseases can be minimized at a great extent. Another significant cause of accidents in the ship recycling yard is the lack of proper training of the worker.

The recent amendment of BLA 2006 (amended in 2013) has also included some provisions in the section 78(a) stating "(1) In an applicable case, an employer shall not engage any workers in work without providing and ensuring use of personal safety equipment (PPE), and in doing so, a record book shall be maintained as designated by the owner.

(2) In spite of supply of personal safety equipment if those are not used by workers concerned, they are to be held liable thereof.

(3) For ensuring professional health and safety for workers at workplace, each of workers shall have to be aware on the risk of the work through trainings."

Section 205 of the BLA 2006 requires employers employing more than 50 workers in any establishments to set up a 'participation committee' - including worker and management representatives – one of whose functions is to 'improve and maintain safety, occupational health and working conditions'.

Several provisions to improve workplace safety have now been included in the law, such as the creation of Occupational Safety and Health (OSH) Committees in factories with 50 workers or more. The Bangladesh Labour Rules 2015 have a schedule describing the formation and duties of the OSH committee. DIFE has the responsibility to inspect health and safety conditions of workplaces and conduct on the spot inspections.

I believe if the owners of the ship recycling yard follow the national rules and regulations earnestly, the working condition can be improved and environmental pollution can be lessened. All the public regulatory authorities such as- DIFE, the department of Environment,

The explosive department, Fire service and Civil Defense etc are to be strict in implementing their respective acts and rules. I again want to recall one thing. The Ship Breaking and Recycling Rules, 2011 is exclusively formulated for this sector. Under this rules, there is a Ship Building and Ship Recycling Board (SBSRB). It is ONE STOP SERVICE provider under the Ministry of Industries. It will provide integrated service for Ship breaking, recycling and other related activities. So, SBSRB has the responsibility to better co-ordinate with the other public bodies as to ensure the required laws in the sector. We collectively with our concerted effort may make ship recycling yard a safe working place for the workers and save the environment from being further polluted.

It may be mentioned that the Ministry of Industries has taken a Project in assistance with the help of International Maritime Organization (IMO) named "Safe and Environmentally Sound Ship Recycling in Bangladesh" (SENSREC) - Phase 1, which is completed in the month of December 2016. In this phase five work packages have been completed as (1) Economic and environmental impact of ship recycling industry in Bangladesh (2) Plan for management of hazardous materials (3) Refinement of Government 'One Stop service' (4) Development of training for health , safety and environmental compliances and (5) Prepare Project Document for Phase II of the Project. It is hoped that during Phase II of the project there would be training programe on occupational health and safety and other related issues for all stakeholders, introduction of 'One Stop Service' and establishment of Treatment, Storage and Disposal facilities (TSDF) will be done. We believe that these activities of the SENSREC project would help to make the Ship Breaking Industry as green industry.

DIFE inspector monitoring the shipbreaking industry

পেশাগত রোগ ঃ প্রতিরোধ ও প্রতিকার

ডাঃ শফিউর রহমান
সহকারী অধ্যাপক
পেশা ও পরিবেশ স্বাস্থ্য বিভাগ,
নিপসম, মহাখালী, ঢাকা।

বর্তমান বিশ্বে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশে পোষাক শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধান খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে, মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে, সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ার প্রয়োজনে ও বহিঃবিশ্বের ক্রেতাদের চাহিদা মোতাবেক পোষাক শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিধান একান্ত প্রয়োজন। একজন শ্রমিক অসুস্থ হলে একদিকে যেমন তার স্বাস্থ্যগত, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক ক্ষতি হয় অন্যদিকে কারখানার মালিক/কর্তৃপক্ষের ক্ষতি হয়, তদ্রূপ ক্ষতি হয় রাষ্ট্রের। তাই শ্রমিকদের সুস্বাস্থ্য জাতির কাম্য।

শ্রমিকদের অসুস্থতার বিভিন্ন কারণ

স্বাভাবিকভাবে একজন শ্রমিক যে কোন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া পেশাগত কাজের কারণে অনেক সময় অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। যেকোন কারণেই হোক না কেন কোন শ্রমিক যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে সাথে সাথেই তাকে কাজ থেকে বিরতি দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কারখানার নিজস্ব চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকলে যে কোন হাসপাতালে বা বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসা করানো প্রয়োজন, তাহলে কর্তৃপক্ষকে তার ব্যবস্থা করা উচিত।

১। দুর্ঘটনা জনিত অসুস্থতা ঃ কলকারখানার কর্মরত শ্রমিক যেকোন সময়ে অসাবধানতাবশত: অথবা যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে যে কোন রকম দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে পারে। দুর্ঘটনা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কারণে হয়ে থাকেঃ-

ক) কারখানার ভেতরে পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতার অভাবে;
খ) যন্ত্রপাতি ব্যবহারজনিত কারণে; এবং
গ) রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার জনিত কারণে

২। ধূলাবালির কারণে অসুস্থতা ঃ যে সমস্ত কারখানায় প্রচুর পরিমাণ ধূলাবালি ও আঁশ বাতাসে ঘুরে বেড়ায় এবং এ সমস্ত ধূলাবালি ও আঁশ নি:শ্বাসের সাথে শরীরের ভিতর ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং ফুসফুসে রোগ সৃষ্টি করে।

৩। অপর্যাপ্ত আলোর কারণে অসুস্থতা ঃ কারখানার ভিতরে প্রচুর পরিমাণে আলোর প্রয়োজন। অপর্যাপ্ত আলোর মধ্যে কাজ করার কারণে শ্রমিকদের নানা রকম চক্ষুরোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এতে মাথা ব্যথাসহ দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসতে পারে।

৪। অধিক তাপের কারণে অসুস্থতা ঃ যে সমস্ত কারখানার ভিতরে অত্যধিক তাপ উৎপন্ন হয় সে সমস্ত কারখানায় প্রচুর পরিমাণে গরম বাতাস নিস্কাশনের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা যায় অত্যধিক তাপের কারণে শ্রমিকগণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এতে মারাত্মক ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

দুর্ঘটনার ব্যাপকতা, সংখ্যা ও প্রকারভেদ নির্ভর করে প্রধানতঃ কয়েকটি বিষয়ের উপর

শিল্প ও কলকারখানায় প্রধানতঃ তিনটি বিশেষ অবস্থায় দুর্ঘটনা ঘটে থাকে ঃ-
১। কর্মস্থলে (কলকব্জার জটিলতার জন্য);
২। কর্ম প্রক্রিয়ায় (প্রক্রিয়াজাত ত্রুটির জন্য); এবং
৩। কর্মীর মাধ্যমে (অসাবধানতার জন্য)

একটি কারখানায় দূর্ঘটনার প্রধান কারণসমূহ

১. অসাবধানতা।
২. অন্যমনস্কতা।
৩. নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।
৪. ধূমপান করা।
৫. ঢিলা পোষাক পরে কাজ করা।
৬. যন্ত্রপাতিতে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকা।
৭. পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখা।

দুর্ঘটনা প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ

(১) প্রত্যেককে দুর্ঘটনা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য-জ্ঞান দেয়া।
(২) কলকারখানায় যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার।
(৩) যন্ত্রপাতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজিয়ে রাখা।
(৪) কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা।
(৫) পেশাগত নিরাপত্তা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
(৬) উপযুক্ত লোক যথাস্থানে নিয়োগ করা।
(৭) প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ফার্স্ট এইড বক্সসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হাতের কাছে রাখা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধে সকলকে প্রশিক্ষিত করা।
(৮) দুর্ঘটনা প্রতিরোধ বিষয়ক নিয়মিত মহড়ার ব্যবস্থা করা।

দুর্ঘটনা এড়াবার বা প্রতিহত করার উপায়

নিরাপত্তা নীতি, নিরাপত্তা নির্দেশ, নিরাপত্তা তদারকি, দুর্ঘটনার সঠিক তদন্ত, প্রতিকার, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা এবং নিরাপত্তা আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কলকারখানায় দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমানো সম্ভব।

কলকারখানায় দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার ছয়টি সাধারণ নীতি

১। দুর্ঘটনা প্রতিরোধ উত্তম ব্যবস্থাপনা ও উত্তম শ্রমের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত।
২। দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের আন্তরিক সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন।
৩। নিরাপত্তা বিধান করার জন্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাকে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে।
৪। প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ও অবগত নিরাপত্তা বিধি থাকতে হবে।
৫। নিরাপত্তা বিধান করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ও প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে।
৬। নিরাপত্তা বিধান করার লক্ষ্যে সর্বস্তরে, সর্বক্ষেত্রে সর্বোচ্চ জ্ঞান ও সর্বোত্তম প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

সতর্কবাণী

১) ঢিলা পোষাক পরিধান করে চলমান যন্ত্রের কাছে কাজ করবেন না। কারণ ঢিলা পোষাক পরিধান করে চালু যন্ত্রের কাছে কাজ করার সময় কাপড় আটকিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
২ ওয়েলডিং এর কাজ করার সময় চোখে শীল্ড ব্যবহার করুন। কারণ চোখে শীল্ড ব্যবহার না করলে ওয়েলডিং এর সময় উৎপন্ন অতি বেগুনী রশ্মি চোখের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে, এমনকি তাতে দৃষ্টিশক্তি লোপ বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
৩ উচ্চ মাত্রার শব্দের স্থলে কানে শব্দ প্রতিরোধের "ইয়ার পল্টাগ" ব্যবহার করুন। শব্দের তীব্রতা ৯০ ডেসিবল এর বেশি হলে শ্রবণশক্তি লোপ বা দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি হতে পারে।

৪ কলকারখানায় ব্যবহৃত বা উৎপন্ন বিষাক্ত গ্যাস কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নিকেল, কার্বোনিল, এমোনিয়া, ক্লোরিন ইত্যাদি জীবনের প্রতি হুমকি স্বরূপ এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এই সকল স্থানে কাজ করার সময় প্রয়োজনীয় গ্যাস মাস্ক ও আই প্রটেক্টর ব্যবহার করুন।

৫ বৈদ্যুতিক তারের ইনসুলেটর নষ্ট হয়ে গেলে শর্ট সার্কিট হয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কলকারখানায় পড়ে থাকা বৈদ্যুতিক তার খালি হাতে স্পর্শ করবেন না। বৈদ্যুতিক জীবন্ত তারের সংস্পর্শে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

৬ উপরে কাজ করার সময় এবং মালামাল উঠা নামা করার সময় মাথায় হেলমেট ও প্রয়োজনীয় সেফটি ডিভাইস ব্যবহার করুন। অন্যথায় পড়ে গিয়ে বা ভারী বস্তু উপর থেকে পড়ে মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত বা নিহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৭ রাসায়নিক পদার্থ যথা সালফিউরিক এসিড, আর্সেনিক কম্পাউন্ড ও অন্যান্য এসিড ত্বকের জন্য খুবই ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। এসকল পদার্থ ব্যবহারের সময় হাতে দস্তানা ও প্রয়োজনীয় সেফটি ডিভাইস ব্যবহার করুন।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

শ্রম আইন ২০০৬-এ যে সমস্ত শ্রমিক অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করে তাদের জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

সুরক্ষা সরঞ্জাম নির্বাচন

ক্ষতির ব্যাপকতা মূল্যায়ন পূর্বে সুরক্ষা সরঞ্জাম নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে:

১ শ্রমিককে সম্ভাব্য ক্ষতিসমূহ থেকে পর্যাপ্ত সুরক্ষা দিতে পারে।
২ কার্যকর সুরক্ষার পাশাপাশি অধিকতর আরামপ্রদ ও ন্যূনতম ওজন।
৩ স্বাভাবিক চলাফেরায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।
৪ গ্রহণযোগ্য মানের সামগ্রী দ্বারা প্রস্তুত।
৫ সরঞ্জামসমূহ উপযুক্ত মান নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষিত এবং অনুমোদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম দু'টি ভাবে শ্রেণিভুক্ত করা যেতে পারে:
ক) শ্বাসতন্ত্র বিষয়ক ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম।
খ) আশ্বাসতন্ত্র বিষয়ক ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম।

অশ্বাসতন্ত্র বিষয়ক সরঞ্জাম

১ মাথা সুরক্ষা- নিরাপদ হেলমেট বা টুপি
২ মুখমন্ডল ও চোখ রক্ষা-ফেস মাস্ক।
৪ শ্রবণ রক্ষা- এয়ার মাস্ক।
৫ হস্ত এবং বাহু সুরক্ষা-গ্লাভস
৬ পায়ের সুরক্ষা-সেফটি সু, বুট জুতা, ফুট গার্ড, তাপরোধক জুতা, বৈদ্যুতিক বিপদ রক্ষা জুতা ইত্যাদি।
৭ শরীরের সার্বিক সুরক্ষায় সুরক্ষা পোষাক- সুরক্ষা পোষাক বলতে সাধারণত এপ্রোন, ওভারন, জ্যাকেট, আপাদমস্তক সুরক্ষা পোষাক ইত্যাদি
৮ শ্বাসতন্ত্র সম্পর্কিত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

এগুলো সাধারণত দুই ধরনের
১। বায়ু সরবরাহ সুবিধাসহ জাতীয়
২। বায়ু পরিশোধন সুবিধাসহ জাতীয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা

১। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সকল কর্মকালীন সময়ে সহজে প্রাপ্য নরম স্থানে প্রাথমিক চিকিৎসার বক্স রাখতে হবে এবং বাক্সের সংখ্যা হতে হবে অন্তত প্রতি ১৫০ জন শ্রমিকের জন্য ১ টি হিসেবে।

২। প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স দায়িত্বশীল ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে। এরূপ ব্যক্তি প্রাথমিক চিকিৎসায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবেন এবং কর্মকালীন সময়ে উপস্থিত থাকবেন।

ট) ডিসপেনসারি ঃ

১। ৫০০ বা ততোধিক শ্রমিক কর্মরত প্রতিটি কারখানায় ১টি ডিসপেনসারি থাকতে হবে। কারখানার অন্যান্য অংশ হতে ডিসপেনসারি আলাদা থাকতে হবে। উক্ত ডিসপেনসারি একজন যোগ্যতাসম্পন্ন মেডিক্যাল প্রাকটিশনারের তত্ত্বাবধানে অন্তত একজন যোগ্যতাসম্পন্ন কম্পাউন্ডার, নার্স এবং অন্যান্য নির্দেশিত কর্মচারীর সমন্বয়ে হতে হবে। কর্মকালীন সময়ে সর্বদা উক্ত মেডিক্যাল প্রাকটিশনারের উপস্থিতি নিশ্চিত হতে হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণরত একজন শ্রমিক

Building Culture of workplace Safety in Bangladesh

Steve Needham
Senior Communication Officer
ILO, Bangladesh

Since the collapse of Rana Plaza in April 2013, the International Labour Organization (ILO) has worked closely with the Government of Bangladesh, employers and workers organizations to help build a culture of Occupational Safety and Health in the readymade garment sector.

Through training and education as well as broad awareness campaigns and materials, workers and employers are benefiting from improved safety practices and are better able to fulfill the objectives of the National Action Plan on Fire and Building Safety.

During four years time many, things have changed, our joint efforts having made a considerable contribution towards ensuring safer work places for millions of Bangladeshi men and women.

On this National Safety Day 2017, it is the ideal time to reflect upon what has been achieved and to set our sights on further efforts to make every workplace a safe workplace.

In the immediate aftermath of Rana Plaza the priority was to inspect all 3,500 export-oriented RMG factories for safety. Through the combined efforts of the Accord, Alliance and the national initiative supported by ILO with funding from Canada, the Netherlands and the United Kingdom this was achieved by the end of 2015.

Teams of engineers visited every factory to assess its structural, fire and electrical safety. Of these factories some 39 were closed as they posed an immediate danger to workers. All others have embarked on the process of remediation, putting to right the faults identified by the inspections. Across the industry, factories now have proper fire doors, safer electrical wiring and emergency evacuation plans, to name but a few of the changes made.

Underpinning this work was a major effort to develop harmonized standards for inspections as well as protocols for the follow up processes. These steps provide a foundation upon which the future of factory and building safety in Bangladesh will be built.

Today, efforts to remediate RMG factories are making progress, albeit at a slower than ideal pace. For those factories which fall under the National Initiative supported by ILO we are working together with the Government to establish a Remediation Coordination Cell to drive compliance and remediation forward. This dedicated unit will bring together the Labour Inspectorate, Fire Service and those responsible for building permits in one agency that has credibility, is trustworthy and can effectively manage fire and structural safety. The RCC will provide follow up and assistance to some 1,500 factories under the National Initiative so that they know what to do, how and when to do it.

The establishment of this body signifies another major step in efforts to not only bring about change, but to institutionalize it. Major support has been provided over the past years to the reform of the Department of Inspections for Factories and Establishments (DIFE). DIFE is on the front line to ensure workplace safety as its inspectors visit factories and establishments across the country every day. ILO has worked closely with DIFE to develop strategies, systems and processes which help it carry out its vital mandate in a more effective, credible and Accountable manner. Likewise support has also been provided to the Fire and Civil Defense. Its inspectors are now better trained in following up on factory safety inspections as well as in vital areas such as electrical safety – the leading cause of fires in the RMG sector.

There is now enhanced collaboration between regulators. Inspectors from the fire service and DIFE are visiting factories together, not only providing a more comprehensive inspection service, but also better support and advice at factory level. This collaboration will play an important role in helping the RCC carry out its work effectively.

The institutionalization of OSH in Bangladesh has also taken a major step with the establishment of OSH units within DIFE and employers organizations. The Bangladesh Employers Federation (BEF), Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) have all set up in-house units to help support their members in OSH related issues.

Trade union trainers and women union leaders/organizers groups have also been organized under the auspices of the National Council for the Coordination of Workers' Education (NCCWE - covering 13 workers federations) to help increase the participation of workers in Safety Committees and to enhance women workers' participation in OSH actions at factory level. A similar program is being developed together with the Industrial Bangladesh Council (IBC - covering 9 federations). A second phase of this initiative will see those trained pass on their skills to help develop awareness of safety issues amongst 2,700 workers.

Major efforts are being made to build better awareness of OSH at all levels of the industry.

The Bangladesh Employers Federation has, with the support of ILO, trained 8,038 mid-level manager/supervisors as well as BGMEA and BKMEA staff in the essentials of OSH. They in turn are passing on these skills to 800,000 workers in 585 RMG factories.

The ILO/IFC Better Work programme is working with some 120 factories employing over 240,000 workers to help enhance workplace compliance as well as competitiveness. Meanwhile a major campaign aimed at raising awareness of OSH with garment workers across the country was launched in March 2017.

Entitled 'Safe Workplaces, Go ahead Bangladesh', the campaign will reach out to up to one million workers though a series of lively safety-related radio dramas aimed at building their awareness and understanding of key OSH issues.

A wide range of materials has also been produced to help increase awareness of OSH. Kits have been produced for Safety Committees providing comprehensive information on the role of the Committees and the issues they must deal with. Other materials such as a '10 tips on OSH' brochure aimed at workers and the general public have been produced and distributed in large numbers nationwide.

Meanwhile at the policy level ILO has supported the development of a National OSH profile and is supporting the implementation of the National OSH Policy as well as the formulation of a National Plan of Action for OSH.

While much as been done and have been many achievements it is vital that momentum is not lost and that efforts continue to help a culture of Occupational Safety and Health take root in Bangladesh. As we look ahead it is important for what has been done in the RMG sector to increasingly benefit other industries as well as workers in the informal sector.

ILO will continue its support of Bangladesh in this regard as we strive to meet our goal of creating Decent Work for all.

Inspector of DIFE is giving necessary instructions on safety measures

প্রেক্ষাপট শ্রম আইনঃ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

এম এ রশীদ
অতিরিক্ত শ্রম পরিচালক
শ্রম পরিদপ্তর, ঢাকা
E-mail: rashid101_2005@yahoo.com

'স্বাস্থ্যই সম্পদ এবং স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল'-এই চিরন্তন সত্য কথাটি আমরা সকলেই জানি কিন্তু কিছু অমনোযোগিতার কারণে আমরা তা মানিনা। যে ব্যক্তি কোন পেশায় নিয়োজিত থেকে শ্রম দিচ্ছে এবং বিনিময়ে পণ্য কিংবা সেবা উৎপাদন করছে আর তার রোজগার দ্বারা নিজের পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ আনয়নে অবদান রাখছে-তার ক্ষেত্রে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া ও কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টি অত্যধিক গুরুত্ব বহন করছে ।

শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে শ্রম আইনের প্রথম থেকে নবম, দ্বাদশ, ষোড়শ ও ঊনবিংশ থেকে একবিংশ অধ্যায়সমুহে বিস্তারিতভাবে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। একজন শ্রমিক স্বাভাবিকভাবেই যেকোন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। পেশাগত কাজের কারণে শ্রমিকগণ অনেকসময় অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। যখন কোন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়ে সাথে সাথে তাকে তার কাজ থেকে বিরতি দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কারখানার নিজস্ব কর্তৃপক্ষকে তার ব্যবস্থা করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। যে সকল কারণে শ্রমিক অসুস্থ হতে পারে তা হলো ঃ

- কারখানার ভেতরে পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতার অভাব ।
- যন্ত্রপাতি ব্যবহারজনিত কারণে শ্রমিক অসুস্থ হতে পারে।
- রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারজনিত কারণে শ্রমিক অসুস্থ হতে পারে।
- ধুলাবালিজনিত কারণে অসুস্থতা।
- অপর্যাপ্ত আলোর কারণে অসুস্থতা।
- অধিক তাপের কারণে শ্রমিক অসুস্থ হতে পারে।
- অধিক শব্দের কারণে শ্রমিক অসুস্থ হতে পারে।

২. কারখানায় দুর্ঘটনার কারণসমুহ হলো ঃ

- অসাবধানতা।
- অন্যমনস্কতা।
- নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ।
- ধূমপান করা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তামূলক পোশাক পরে কাজ না করা।
- যন্ত্রপাতিতে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকা।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় না রাখা।
- শিল্প-কারখানায় দুর্ঘটনা মোকাবেলায় শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, পারিবারিক এবং জাতিগত নানা ক্ষয়ক্ষতি ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়। যেমন ঃ

(ক) শ্রমিকের বেলায় ঃ

১. শারীরিক অসুস্থতা, অশান্তি ও কষ্ট পাওয়া ।

২. স্থায়ী পঙ্গুত্বের শিকার হওয়া ।

৩. পুনরায় পূর্ণ কর্মক্ষমতা ফিরে না পাওয়া ।

৪. মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া ।

৫. আয়ু নষ্ট হওয়া বা কমে যাওয়া ।

(খ) ব্যবস্থাপনায় ঃ

১. উৎপাদন নষ্ট হয়ে যাওয়া ।

২. উৎপাদিত বস্তুর মান ও পরিমাণ কমে যাওয়া ।

৩. অসুস্থ শ্রমিকের পরিবর্তে অতিরিক্ত সময় কাজ চালান এবং তার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বেড়ে যাওয়া ।

৪. পঙ্গু শ্রমিককে পুনর্বাসনের অসুবিধা ও ব্যয় বেড়ে যাওয়া।

৫. পুনরায় নতুন শ্রমিককে প্রশিক্ষণের অসুবিধা ও খরচ।

৬. চিকিৎসার খরচ বেড়ে যাওয়া ।

৭. বীমার ক্ষতিপূরণ খরচ বেড়ে যাওয়া ।

৮. দক্ষ শ্রমিককে আকৃষ্ট করার অসুবিধা ।

(গ) পারিবারিক পর্যায় ঃ

১. প্রিয়জনকে হারানোর ব্যথা ।

২. অসহায় পরিবারকে সহায়তা করার অসুবিধা ।

৩. পারিবারিক কাজে সহায়তার পরিমাণ কমে যাওয়া ।

(ঘ) জাতীয় পর্যায় ঃ

১. দক্ষ শ্রমিকের মৃত্যুতে জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি।

২. দক্ষ শ্রমিকের অভাবে জাতীয় উৎপাদন ব্যাহত হওয়া।

৩. বিশেষ কর্মে শ্রমিকদের কাজ করার অনীহা বা কাজ না করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া।

(ঙ) দুর্ঘটনা প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ঃ

১. দুর্ঘটনা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য জ্ঞান দেয়া।

২. কলকারখানায় যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার।

৩. যন্ত্রপাতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে সাজিয়ে রাখা ।

৪. কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা ।

৫. সেফটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ।

৬. উপযুক্ত লোক যথাস্থানে নিয়োগ করা ।

৭. প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ফার্স্ট এইড বক্স প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রসহ হাতের কাছে রাখা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধে সকলকে প্রশিক্ষণ দান করা ।

৮. দুর্ঘটনা প্রতিরোধ বিষয়ক নিয়মিত মহড়ার ব্যবস্থা করা ।

সেইফটি কমিটি গঠন ঃ

সংশোধিত শ্রম আইনের ৯০ (ক) ধারার বিধান মোতাবেক পঞ্চাশ বা তদুর্ধ্ব সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত আছেন এমন প্রত্যেক কলকারখানায় সেইফটি কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে । গঠিত কমিটি কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকসহ সকলের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে আইন ও প্রচলিত বিধি বিধানের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট মালিক বা কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করবে ।

নারী শ্রমিকের স্বাস্থ্য ঝুঁকি

কোহিনূর মাহমুদ
প্রকল্প সমন্বয়কারী, বিল্‌স

অনেক ক্ষেত্রেই দেশ এগিয়ে চলেছে, আর এ অগ্রযাত্রায় নারীর ভুমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা, নারী ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রবাসী ও রফতানী আয়, খাদ্য উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং অবদান রয়েছে। গত তিন দশকে যে কয়টি ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় জীবনে মৌলিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মজুরি শ্রমিক হিসেবে নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমক্ষেত্রে যোগদান।

নারীর এই ব্যাপক অংশগ্রহণ আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, গ্রামীণ ও নাগরিক জীবন এবং উন্নয়ন প্রেক্ষিতের ভেতর থেকে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। নারীর সক্রিয় প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রমেই সফল হয়েছে জন্মহার হ্রাস, টিকাদান কর্মসূচি, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিসহ যে কোন সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ। এছাড়া নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং অবদানে কমেছে-মাতৃ মৃত্যুহার, শিশু মৃত্যুহার এবং বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার। কিন্তু সময়োপযোগী ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের অভাবে এ পরিবর্তনকে নারীর জীবনমান উন্নয়নে ও সমাজের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নে যথাযথভাবে অনেক ক্ষেত্রেই কাজে লাগানো হয় নি।

সর্বশেষ সরকারি তথ্য অনুযায়ী মোট শ্রমজীবী কর্মজীবী নারীর সংখ্যা ১ কোটি ৬৮ লক্ষ। নারীর গৃহশ্রমের কাজকে অর্থনৈতিক হিসাবের মধ্যে আনলে এ সংখ্যা অনেক বেশী। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের হার যেমন বেড়েছে তেমনি নারীর কাজের পরিধি এবং ধরনও বেড়েছে। কিন্তু যেভাবে আমাদের পরিবারগুলো তাদের মেয়েদের বাইরের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য মানসিকভাবে তৈরি হয়েছে, সমাজের দৃষ্টিভংগি পরিবর্তিত হচ্ছে, সেভাবে কর্মক্ষেত্রগুলি নারীর উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়নি। নারীর জন্য নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা, নিরাপদ আবাসন কোনটাই গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। কিন্তু নারী যেখানে কাজ করে সেখানকার অব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তাহীনতা, বৈষম্য এবং নানা ধরনের সমস্যায় নারী কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী অসহায় বোধ করে। কর্মক্ষেত্র তো বটেই এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সন্তান, পরিবার এবং সমাজে।

তাজরিন ও স্মার্ট গার্মেন্টস্ এবং টাম্পাকো অগ্নিকান্ডে শত শত শ্রমিকের আগুনে পুড়ে মারা যাওয়া এবং সাভারের রানা প্লাজা ধসের মহাবিপর্যয়ে অসংখ্য শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু শ্রমজীবী মানুষের সাথে সাথে দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে এবং আন্তর্জাতিক মহলে শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে আলোড়িত ও আলোচিত হয়েছে। প্রতি বছর এধরনের দূর্ঘটনায় শুধুমাত্র যে শ্রমিক প্রাণ হারাচ্ছে তা-ই নয় হাজার হাজার শ্রমিক পঙ্গু হয়ে মানবেতর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। এতে শ্রমিক বা শ্রমিক পরিবারই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেনা সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং দেশ দক্ষ শ্রমশক্তি হারাচ্ছে। ফলে দেশের বাইরে এবং ভেতরে শ্রমিকের জন্য কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার দাবী আজ জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে।

কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে যেকোন ধরনের দূর্ঘটনাই মানুষের মনে প্রচন্ড আলোড়ন তোলে। কেননা এটা কোনভাবে গোপন করা যায়না এবং মিডিয়ার ব্যাপক বিস্তৃতির কারণে সকলে জেনে যায়। কিন্তু শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে তেমন কোন আলোচনা নেই বললেই চলে। কেননা এটা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে। এতে শ্রমিক বিভিন্ন ধরনের অসুখে ভুগে তার কর্মক্ষমতা হারায় এবং পরিশেষে ধুকে ধুকে মারা যায়। পেশাগত রোগে কত শ্রমিক মারা যায় বা কর্মক্ষমতা হারায় বা শ্রমিকের আয় ও উৎপাদনশীলতা কমে এবং এর ফলে শ্রমিক পরিবার, ব্যবসা এবং দেশের অর্থনীতি কী ধরনের বিপর্যয়ে পড়ে তার কোন সঠিক পরিসংখ্যান জানা যায় না।

কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ, কাজের ধরন এবং কাজের শর্ত যদি এমন হয় যে, কাজ চলাকালীন সময়ে বা কাজের আগে বা পরে শ্রমিক অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন ঐ কর্মক্ষেত্র স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। সাধারণত: স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনের দুর্বল প্রয়োগ, পরিকল্পিতভাবে শিল্প কল-কারখানা গড়ে না তোলা, অপরিচ্ছন্ন কর্মপরিবেশ,অপর্যাপ্ত আলো, অধিক তাপ ও শব্দ, যান্ত্রিক ত্রুটি, অতিরিক্ত কাজ ও অতিরিক্ত ওজন বহন, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রির অপ্রতুলতা এবং ব্যবহার না করা এবং অপুষ্টির কারণে পেশাগত রোগের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ, মালিক-শ্রমিক এবং শ্রমিক-শ্রমিক পারস্পরিক সম্পর্ক, অশোভন আচরণ, দীর্ঘ কর্মসময়, কম মজুরি ও চাকুরির অনিশ্চয়তা ইত্যাদি কারণে শ্রমিক মানসিক সমস্যার পাশাপাশি শারীরিক সমস্যায় ভোগে।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, একটি কর্মক্ষেত্র শ্রমিকের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কি-না বা কর্মক্ষেত্রটি স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ কি-না তা কীভাবে বোঝা যাবে? এর উত্তরে বলা যায়, শ্রমিক নিজেই কর্মস্থলের স্বাস্থ্য ঝুঁকি চিহ্নিত করতে পারে। যেমন: সাধারণত: রাসায়নিক দ্রব্য, ধুলাবালি ইত্যাদির জন্য কাজের জায়গার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া দূষিত ও ক্ষতিকারক হয়, এর ফলে শ্রমিকের শ্বাসকষ্ট হয়। আবার চোখ জ্বালাপোড়া, চোখ দিয়ে পানি পড়া, মাথা ধরা, বমিভাব, কানে শোনার সমস্যা, পাকস্থলির সমস্যা ইত্যাদি হতে পারে। এসকল সমস্যা দীর্ঘমেয়াদে শ্রমিকের জীবন সংকটাপন্ন করে তোলে।

একজন নারী শ্রমিক কর্মস্থলের এসকল স্বাস্থ্য ঝুঁকির পাশাপাশি অন্যান্য জটিলতায়ও ভুগে থাকেন। বিশেষ করে গর্ভবতী নারী শ্রমিকের ক্ষেত্রে তার কাজের ধরন, পরিবেশ তার গর্ভস্থ সন্তানের ওপর বহুমুখী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যেমন : ভারী কাজ , বেশী ওজন বহন, দাঁড়িয়ে এবং দীর্ঘ সময় কাজ করার ফলে গর্ভবতী নারীর মেরুদণ্ড ও মাংশপেশীতে ব্যথা, অপুষ্টি ও রক্তশূণ্যতা, খিচুনী ,সময়ের আগে প্রসব এবং অপুষ্ট ও কম ওজনের শিশুর জন্মগ্রহণ এবং কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত তাপমাত্রা, শব্দ দূষণময় পরিবেশ এবং ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক ব্যবহারের কাজে নিয়োজিত নারীর বধিরতা, উচ্চ রক্তচাপ, গর্ভপাত এমনকি বিকলাঙ্গ ও মৃত শিশু প্রসব করার মত মারাত্মক বিপর্যয় ঘটতে পারে। যেহেতু মা ও গর্ভস্থ শিশু একই সত্ত্বা, সেহেতু মায়ের যেকোন ঝুঁকিই বাচ্চাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

নিজেদের সুরক্ষার প্রয়োজনেই নারী শ্রমিকদের সচেতন হতে হবে। একজন সচেতন শ্রমিকই হতে পারে ঝুঁকি চিহ্নিত করা ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করার জন্য বড় পরিদর্শক। যদি কর্মক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা তৈরি করা যায় যাতে নারী শ্রমিকই স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করে কোন রকম ভয়ভীতি ছাড়াই তা উপস্থাপন করতে পারে। তবে নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেকাংশেই লাঘব হতে পারে।

বাংলাদেশের শ্রম আইন, শ্রম নীতি, এবং শ্রম বিধিতে শিল্প ও শ্রমিকের নিরাপত্তা, বিশেষ করে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। বিধি মোতাবেক প্রতিটি কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন ও তার কার্যকর পরিচালনার মাধ্যমে কারখানা ও শ্রমিকের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিশেষত নারী শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব।

নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সরকারের একটি বিশেষ অংগীকার এবং এ অংগীকার পূরণে এ বিষয়ে শ্রম আইনের নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কি-না তার যথাযথ তদারকি করাও সরকারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হওয়া প্রয়োজন।

একজন নারী শ্রমিক শুধুমাত্র উৎপাদন ও উন্নয়নেই ভুমিকা রাখেন না। পরিবার, সমাজ ও জাতি গঠনে তিনি রাখেন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা এবং তার ভেতরেই লুকিয়ে আছে আমাদের আগামীর সম্ভাবনা।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ঃ ঝুঁকি, নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনা রোধে করণীয়

সেইফটি এন্ড রাইটস্ সোসাইটি (এসআরএস)

১. প্রাসঙ্গিকতা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদন, আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখছে। লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১০ অনুসারে, ৮৭.৫% কর্মক্ষম লোক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করছে, যাতে অধিকাংশই হলো নারী। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক কান্ট্রি রিপোর্ট ২০১০ অনুসারে, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রতি বছর ৪০%-র বেশী মূল্য সংযোজিত হয় অথচ এ খাত প্রচলিত কোন আইন দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত নয়। যার কারণে এ ক্ষেত্রে ঝুঁকির পরিমাণ বেশী এবং নিরাপত্তা শঙ্কাও অনেক বেশী।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত বলতে সাধারণত, যে সকল কর্মক্ষেত্র প্রচলিত কোন আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং যা নিয়মিত চাকুরির নিশ্চয়তা প্রদান করে না।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০০৬ অনুসারে, "অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত" অর্থ এইরূপ বেসরকারি খাত যেখানে কর্মরত শ্রমিকের কাজের বা চাকুরির শর্ত, ইত্যাদি বিদ্যমান শ্রম আইন ও তদাধীন প্রণীত বিধি-বিধানের আওতায় নির্ধারিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত নহে এবং যেখানে কর্মরত শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের তালিকা ঃ যদিও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত সম্পর্কে কোন আইনে বিস্তারিত বলা নাই, তারপরেও আইন দ্বারা চিহ্নিত প্রাতিষ্ঠানিক খাতের বাহিরের খাতকেই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, যেমনঃ কৃষি ও কৃষিভিত্তিক ক্ষেত্র যেমন, হাঁস-মুরগী পালন, পশু পালন, দুগ্ধ খামার, দিন মজুর, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি, গৃহশ্রম, যানবাহন সেক্টর, রিক্সাওয়ালা, মাঝি, হস্তশিল্প ইতাদি।

ঝুঁকি ঃ 'ঝুঁকি' হলো আহত হওয়ার সম্ভাবনা বা এমন একটি পরিপার্শ্বিক অবস্থা যাতে কেউ আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এর থেকে সম্ভাব্য আঘাতের পরিমাণ ও প্রভাব অনুধাবন করা যায়। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ৩৯ ধারার বিধান অনুসরণ করে সরকার প্রতিবছর গেজেট আকারে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রকাশ করে থাকে; ২০১৩ সালে প্রকাশিত গেজেটে যেসব কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

ক্রমিক নং	অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
০১.	পাইপের সাহায্যে মুখ দিয়ে পেট্রোল বা ডিজেল টানিয়া লওয়া	হাঁপানী (এ্যাজমা), শ্বাসনালীর সংক্রমণ (ব্রংকিউলাইটিস)
০২.	শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে এক নাগাড়ে ক্ষতিকর পদার্থ গ্রহণ করা	ফুসফুসের রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ও হৃদরোগ জনিত শারীরিক সমস্যা
০৩	কাজের সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ইট-পাথরের গুড়া গ্রহণ করা	সর্দি-কাঁশি, ফুসফুসে প্রদাহ ও সিলিকোসিস

০৪.	ক) ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের জন্য ছাঁচ তৈরি করা খ) গরম ও জ্বলন্ত ধাতব কণা ও ধুলাবালির সংস্পর্শে কাজ করা	দুর্ঘটনাজনিত আঘাত, শিরায় রক্তজমাট বাধা, চোখের প্রদাহ, চোখের পানি পড়া, দৃষ্টি শক্তির সমস্যা
০৫.	ক) লবণে আয়োডিন সংমিশ্রণ করা খ) লবণ মাপা ও মোড়কজাত করা	শরীর ফুলে যাওয়া, রক্তশূন্যতা, এলার্জি, হাতে-পায়ে ফাঙ্গাস ও ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমন
০৬.	নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার না করে ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা	দেহে সীসা প্রবেশ জনিত প্রদাহ, পেটে ব্যথা, যকৃতে প্রদাহ, এ্যাজমা
০৭.	ক্ষতিকারক গ্যাস দিয়ে কাজ করা	চোখ জ্বালা করা, অন্ধত্ব, নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট
০৮.	প্রচন্ড তাপ ও উচ্চ শব্দের মধ্যে কাজ করা	ক্রমাগত মাথা ব্যথা, শ্রবনশক্তি লোপ, শ্বাসকষ্ট, বমি, শরীরের চামড়া পুড়ে যাওয়া
০৯.	ক) চোখের তীক্ষ্ণ ব্যবহার করিয়া কাজ করা খ) দীর্ঘ সময় যাবৎ অপর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন ও অল্প আলোতে কাজ করা	চোখ ব্যথা, মাথা ব্যথা, দৃষ্টিশক্তি সমস্যা
১০.	দিন বা রাত উভয় শিফটে দীর্ঘ সময় কাজ করা	মাথা ব্যথা, বমি হওয়া, ক্ষুধা মন্দা, কোষ্টকাঠিন্য

বিপজ্জনক অবস্থা বা হ্যাজার্ড ঃ বিপজ্জনক অবস্থা বা হ্যাজার্ড হলো এমন একটি পরিস্থিতি বা অবস্থা বা ব্যবহার যা জীবন বা স্বাস্থ্য বা সম্পদ বা পরিবেশকে হুমকির সম্মুখীন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়; রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার বিভিন্ন জায়গায় উম্মুক্তভাবে গড়ে উঠেছে পাথরভাঙ্গা শিল্প, এতে কোন ধরনের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবহার ছাড়াই কাজ করছে অসংখ্য শ্রমিক। যাদের অধিকাংশই অতিরিক্ত ধুলা-বালি ও সিলিকার মধ্যে কাজ করার কারণে আক্রান্ত হচ্ছে দুরারোগ্য ব্যাধি সিলিকোসিস এ। সিলিকোসিস-এ আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত মৃত শ্রমিকের সংখ্যাও কম নয়, প্রায় ১০০। বিপজ্জনক অবস্থা বা হ্যাজার্ডকে সাধারণত ছয়টি ভাগে করা যায়; ১. শারীরিক (শব্দ, কম্পন, তাপমাত্রা), ২. রাসায়নিক (বিষ্ফোরক, এসিড, কস্টিক সোডা, সিসা), ৩. নকশাগত (কর্মক্ষেত্রের ধরন, সরঞ্জামের নকশা) ৪. তেজস্ক্রিয়তা (ঝালাই কাজ বা সূর্যের আলো থেকে নির্গত আল্ট্রাভায়োলেট রে, ইনফ্রারেড রে), ৫. জৈবিক (ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া, পরজীবী), ৬. মনস্তাত্ত্বিক (কাজের চাপ, শিফটিং ব্যবস্থা, কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা)।

আইএলও কনভেনশন ১৮২ এ হ্যাজার্ড এর একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়; যেখানে খনি বা সমুদ্রে, সচল যন্ত্রপাতি, ভারী লোড বিয়ারিং, চরম তাপমাত্রা, কৃষি, ট্যানিং, গ্লাস, কীটনাশক, আগাছানাশক, কেমিক্যালস, সিলিকা মাটি সংক্রান্ত কর্মক্ষেত্র ইত্যাদিকে হ্যাজার্ড হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

২. বিগত বছরের দুর্ঘটনার চিত্র (সার্বিক)

সংবাদপত্রের ওপর সেইফটি এন্ড রাইটস্ পরিচালিত জরিপে দেখা যায় বিগত ১ বছরে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০১৬) সারাদেশে শুধু কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় ৩৮২ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে, যেখানে ২০১৫ সালে এ সংখ্যা ছিল ৩৭৩ এবং ২০১৪ সালে ছিল ৩২০ জন, অথচ ২০০৭ সালে এ সংখ্যা ছিল ২২২ জন। এটা পরিষ্কার যে প্রতি বছর কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনার হার ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে নিহত শ্রমিকের বেশির ভাগই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত যেমন- নির্মাণ, পাথর উত্তোলন ও ভাঙ্গা, দিন মজুর, পরিবহন, কৃষি ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত ছিল।

৩. নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় আইন ও নীতিমালা

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়-এ কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা ও পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিধান রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ৫ম অধ্যায়-এ বলা আছে কর্মক্ষেত্রকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও অন্যান্য জঞ্জাল থেকে মুক্ত রাখতে হবে, পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো, বায়ু চলাচল, সহনীয় তাপমাত্রার ব্যবস্থা ও পান করার জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ আইনের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করা আছে; এতে বলা আছে, ভবনের ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তার ব্যবস্থা, অগ্নিকান্ড সম্পর্কে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি ঘিরে রাখা, সিঁড়ি ও যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত রাখা, অতিরিক্ত ওজন পরিহার করা, বিপজ্জনক ধোঁয়া, অতিরিক্ত ধূলা, বিস্ফোরক বা দাহ্য গ্যাস থেকে সতর্কমূলক ব্যবস্থা এবং সর্বদা ব্যক্তিগত সুরক্ষাকারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা এবং এ আইনের ৭ম অধ্যায়ে বিপজ্জনক চালনা, দুর্ঘটনা ও কতিপয় ব্যাধিতে নোটিস প্রদান সংক্রান্ত বিধান উল্লেখ করা আছে। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩-এ কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা ও পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও তা বাস্তবায়ন করার কৌশল বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা আছে।

এছাড়াও শ্রম আইনের ধারা ৮৮ এ বলা আছে যে, সরকার বিধি প্রণয়ন করে যে কোন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত বিধান বা ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারবেন।

৪. দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয়

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও পেশাগত স্বাস্থ্য এবং সেইফটি নিশ্চিতকরণের বিষয়টি বহুমাত্রিক ও ব্যাপক, আর সে বিষয়টি যদি হয় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত তাহলে সেটা বলাই বাহুল্য। দুর্ঘটনা প্রতিরোধে এ খাতে বড় বাধা হলো প্রথমত এ খাতটির ব্যাপ্তি আইন দ্বারা নির্দ্ধারিত নয়, দ্বিতিয়ত এর কাজের পরিবেশ সর্বদা এক রকম থাকে না। তাই এ খাতে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও পেশাগত স্বাস্থ্য এবং সেইফটি নিশ্চিত করার বিষয়টি স্টেকহোল্ডারদের সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রয়াস এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের ওপর নির্ভরশীল। নিম্নে তার কিছু নমুনা উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) সরকারের দায়িত্ব ঃ

- এ খাতটির ব্যাপ্তি আইন দ্বারা নির্ধারিত করে দেয়া এবং এর জন্য আলাদা জাতীয় নীতিমালা ও আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা।

- দুর্ঘটনা ও পেশাগত স্বাস্থ্য এবং সেইফটি ঝুঁকি এবং ঝুঁকিপূর্ণ খাতগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা।

- নারী শ্রমিকদের কথা বিবেচনা করে কর্মস্থলে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করা, বিশেষ করে সন্তান সম্ভবা নারী শ্রমিকদের জন্য কর্মস্থলে বিশেষ স্বাস্থ্য সুবিধাদি নিশ্চিত করা।

- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য (দুর্ঘটনার সংখ্যা, জখম হওয়ার সংখ্যা, অঙ্গহানির সংখ্যা, রোগাক্রান্ত ও স্বাস্থ্যহানির সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা, চিকিৎসা পাওয়ার সংখ্যা, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সংখ্যা, এ সংক্রান্ত মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির সংখ্যা ইত্যাদি) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এতদ্‌বিষয়ে জরিপ/গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১ পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা-২০১৩ অনুসরণে প্রণীত

- শ্রমিকের চিকিৎসা সেবা ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের কর্মক্ষমতা অনুযায়ী তাঁকে কর্মক্ষেত্রে পুনর্বাসন করা।

- এ খাতের জন্য যথাযথ পরিদর্শন, পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা।

- ঝুঁকিপূর্ণ অনানুষ্ঠানিক খাতসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

- নির্মাণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী নির্মাণ প্রতিষ্ঠানকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতি অনুসরণ নিশ্চিত করার শর্ত আরোপ করা।

- জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষা ইনস্টিটিউট যেন অন্যান্য কাজের মধ্যে কর্মজনিত রোগ নিয়ে গবেষণা, প্রাসঙ্গিক স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দান এবং কর্মজনিত রোগীদের বিশেষভাবে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা দিতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

(খ) মালিক ও মালিক সংগঠনের দায়িত্ব ঃ

- এ খাতে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও পেশাগত স্বাস্থ্য এবং সেইফটি নিশ্চিতকরণে মালিক ও মালিক সংগঠনগুলোকে ঐকমত্যে পৌছানো জরুরি।

- দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও পেশাগত স্বাস্থ্য এবং সেইফটি নিশ্চিতকরণে মালিকগণকে উৎসাহিত করা।

- ত্রি-পক্ষীয় ফোরামে এবং বাংলাদেশ শিল্প স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল-এর কাজে অংশগ্রহণ করা।

- জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সুরক্ষা নীতিমালার আলোকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

- মালিক সংগঠনসমূহে বিশেষ পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইউনিট/সেল গড়ে তোলা। উক্ত ইউনিট/সেল কর্তৃক পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক ধ্যান-ধারণাকে হালনাগাদ করা এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

- দুর্ঘটনার পর শ্রমিক এর চিকিৎসা সেবা ও ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক-এর কর্মক্ষমতা অনুযায়ী তাকে কর্মক্ষেত্রে পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।

- কর্মস্থলে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি সনাক্তকরণে (workplace related diseases/occupational health problem) নির্দিষ্ট সময় অন্তর কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার (periodic medical examination) ব্যবস্থা করা।

(গ) শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব ঃ

- পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সুরক্ষায় কর্তৃপক্ষ/নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মেনে চলা এবং সরবরাহকৃত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি (PPE) ব্যবহার করা।

- নিজের ও সহকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেইফটির প্রতি যত্নবান হওয়া।

- কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ সকল কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা এবং এবং প্রাপ্ত জ্ঞান দৈনন্দিন কাজে প্রয়োগ করা।

- স্বাস্থ্যগত কোন সমস্যা অনুভূত হলে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া।

- কর্মক্ষেত্রে কোন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথে তা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত আইন এবং শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মস্থলের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত থাকা ও শ্রমিক কর্মচারীদের অবহিত করা।
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক আইন মেনে চলার প্রতি ইউনিয়নের সদস্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।
- শ্রমিক কর্মচারীদের স্বাস্থ্য ও সেইফটির লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপে অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।
- প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়নে একটি সেইফটি ইউনিট গড়ে তোলা যার দায়িত্ব হবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক ধ্যান-ধারণাকে হালনাগাদ করা এবং কর্মচারীদের পক্ষে সরকার ও নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করা।

(ঘ) নিয়োগকর্তা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ঃ

- কারখানা নির্মাণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা মানদন্ড নিশ্চিত করা এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপদ কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত সকল মানদন্ড ও বিধি-বিধান এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা এবং কর্মস্থলে নিয়োজিত সকল ব্যক্তিকে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্য ও সেইফটি ঝুঁকি সম্পর্কে প্রাক অবহিত করা এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষাকারী সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment-PPE) সরবরাহ এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত প্রযুক্তি, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক ও অন্যান্য পদার্থ/দ্রব্যাদি পরিবহন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর পরিদর্শন সংক্রান্ত কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা।
- যেকোন দুর্ঘটনার পর শ্রমিকের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- কর্মস্থলে নারী শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৫. সেইফটি এন্ড রাইটস্ এর সুপারিশ

* অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে আইন দ্বারা যথাযথভাবে চিহ্নিত করা।
* গার্মেন্টসের ন্যায় নিরাপত্তা কার্যক্রম প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে বর্ধিত করা।
* কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবহার নিশ্চিত করা। ক্ষেত্র বিশেষে শ্রমিকদের মধ্যে বিনামূল্যে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম বিতরণ করা।
* রাজউক, কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ আইন বাস্তবায়নকারী অন্যান্য সকল সংস্থার দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি।
* শ্রম ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালার প্রতি অবহেলা ও লঙ্ঘনকারীর জন্য উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা।
* আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থার স্বেচ্ছাচারিতা ও অবহেলাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা।
* ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আইন সংশোধন করে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় আহত-নিহতের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি এবং দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।
* ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বজন গৃহীত একটি মানদন্ড নির্ধারণ করা। প্রয়োজনে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়ন করা।
* আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণে চিকিৎসা খরচ, পুনর্বাসন এবং পুনঃএকত্রীকরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অন্তর্ভুক্ত করা এবং নিহত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তার পরিবারের অন্তত একজনের পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।
* দুর্ঘটনা প্রতিরোধ কল্পে কল-কারখানার ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে বিল্ডিং কোড মেনে চলা।

Improving OSH conditions in the Construction Industries: Bangladesh Perspective

Md. Kamrul Hasan
Deputy Inspector General (Current Charge)
Department of Inspection for Factories and Establishments
Office of the Deputy Inspector General, Rajshahi.

The term construction covers building, including excavation and the construction, structural alteration, renovation, repair, maintenance (including cleaning and painting) and demolition of all types of buildings or structures. Construction is an emerging sector of Bangladesh. It covers a wide range of activities like construction of residences, roads and highways, bridges, fly overs, sea ports etc. The number of construction companies are increasing day by day in Bangladesh due to rapid urbanization and side effect as the accidents and health related problems. A large number of workers are engaged in this sector and most of them are illiterate. They don't have any knowledge about their safety and health. They just work to fulfill their daily needs. In fact they are very poor and these living conditions are very bad. Also the employers are indifferent about the health and safety of the workers. In fact, in 2013 the Government has amended the labour legislation (Bangladesh Labour Act, 2006) and adopted a new labour rule in 2015 (Bangladesh Labour Rules 2015) concluding some new requirements for general OSH issues but the occupational safety and health conditions in the construction sector is remain same.

According to the labour force survey 2013, the number of population employed over the age of 15 was 58.1 million and among them 3.7% are construction workers. It means the number of workers in the construction sector was almost 2.15 million. The most important thing is that about 28% of this workers are women. According to the Asian Development Bank working paper series report published in April 2009, about 80,665 workers were engaged in the formal construction sector and 1,443,677 workers in the informal construction sector and share to the GDP of the construction sector was 9.2%.But at present the scenario is rapidly changed. According to the Bangladesh Association of Construction Industries, the number of workers in the construction industry is estimated about 3.5 million. So it is clearly seen that the number of workers in the construction industry is increasing day by day because the construction works are increasing rapidly. With the increasing number of construction industries and workers, the number of accidents are also increasing day by day. According to the newspaper survey report from January-December 2015, the number of workers death in the construction sector is 147 and in percentage it is 39.4% among all sectors. So it is clearly seen that about 40% workers died in the construction sector compare to the all sectors in Bangladesh on that year. But it is important to consider that many accidents and deaths are unreported to the newspapers and public. Probably this represents the tip of the iceberg.

Bangladesh Labour Act, 2006 (BLA, 2006) and Bangladesh Labour Rules 2015 (BLR, 2015) have some provisions regarding workplace safety and health of the workers. Chapter five, six, seven and eight of BLA, 2006 and BLR, 2015 are dealing with the workplace health and safety in a wide range. These chapter contains health and hygiene, safety, special provisions relating to health, hygiene and safety and welfare facilities. Also Bangladesh National Building Code, 2006 (BNBC2006) deals with a wide range of issues related to workplace safety and health of the construction workers. Although the existence of a regulation, these are not well shaped with the OSH in the construction sector.

It is clearly seen from the above data that the importance of the construction sector and the number of the construction workers are increasing rapidly day by day. But accidents and deaths are happening every day in this sector but maximum of us are not aware about that. So it is high time to do something regarding safety and health of the construction workers in Bangladesh. Bangladesh Labour Act, 2006, Bangladesh Labour Rules 2015 and Bangladesh National Building Code 2006 have some provisions regarding safety and health in the construction sector. But it is the duty of all stakeholders to be responsible of the working conditions and to comply with the existing rules and regulations. In the construction industry in Bangladesh, the main employer is some big national and multinational companies, real estate business authorities, and also the Government. But most of the construction works are carried out by the sub-contractors and their sub-sub-contractors. Most of the construction workers are recruited in casual basis. They are recruiting without appointment letter, without considering the existing rules and regulations described in the legislation. Moreover they are recruited as day labourer. So the sub-contractors as well as the main contractors are violating the basic rules and regulations described in the BLA 2006 and BLR 2015 regarding employment of a worker. Also the working hour, wages, overtime, employment of adolescent and female workers in the hazardous work, maternity benefit and other welfare facilities are not provided to the construction workers by the employer or the sub-contractors. They have no toilets, no place to eat or to take rest. All these matters are clearly described in the BLA 2006 and BLR 2015. But the general safety of the construction workplace, about scaffolds and ladders, lifting appliances and gears, transportation of materials and handling of the equipment, about working at height and excavations, underground works, tunnels, concrete work, piling, demolition, OSH management system, PPE, information and training are not well described or given to the legislations existing in Bangladesh. Also it is needed to build an OSH culture by involving every stakeholders of the country by making them understand that OSH is a value and the investment on OSH management is an asset not a cost.

ILO C167 Safety and Health in Construction Convention, 1988; ILO R175 Safety and Health in Construction Recommendation, 1988 and ILO Code of Practice 1992, Safety and Health in the Construction give a clear direction to improve the occupational safety and health conditions in the construction sector. Also the ILO OSH 2001, guidelines on occupational safety and health management systems gives a total description about policy, organizing, planning and implementation, evaluation and continuous improvement about occupational safety and health in the construction sector.

So, to improve the occupational safety and health conditions in the construction industries in Bangladesh we have to take some initiatives such as:

a) Identify gaps in the legislation regarding occupational safety and health in the construction sector and take initiatives to amend them.

b) Identify Hazards and Risks in the construction industry.

c) Take initiatives to minimize the accidents and deaths in the construction industries.

d) Provide information, education and training.

e) Adopt ILO tools to improve OSH conditions in the construction Industries.

f) Adopt good practices in the construction industries taken by different Governments and companies all over the world (Such as we can follow EU directives or initiatives taken by Government of Australia or Singapore etc.).

g) Organize social dialogue to make every stakeholders understand about creating OSH culture in the construction industries and their responsibilities.

h) Develop a comprehensive Labour Inspection system in the construction sector.

i) Approval of safety plan by DIFE as a precondition to start any construction work in all sectors.

j) Ratification of ILO C167 and R175.

k) Take a National Plan to improve the OSH conditions in the construction sector in Bangladesh

Construction industries produces unique products and many stakeholders are involved with different interests. The highest rate of fatal and non-fatal accidents occurred in this industry and subcontracting is a major challenge in managing occupational health and safety in this sector. So it is the duty of all stakeholders to ensure occupational health and safety in this sector during pre-construction, execution and post construction phase. Everyone should respect existing rules and regulations, develop policy in the enterprise level and commit to achieve zero accident and diseases in the industry. At last, to achieve the target of sustainable development goals (Goal 8-Decent Work and Economic Growth) which is to achieve full and productive employment, and decent work, for all women and men by 2030, it is necessary to improve occupational safety and health conditions in the construction sector.

"Build OSH culture, build better Bangladesh."

References

1) ILO C167 Safety and Health in Construction Convention, 1988, Article-2.
2) Report on Labour Force Survey 2013, Bangladesh, p. xvi, 54.
3) Asian Development Bank working paper series, April 2009, p. 21-22.
4) Bangladesh Association of Construction Industries,
http://www.baci-bd.org/?page_id=1122.
5) Newspaper Survey Report on Workplace Deaths January-December of 2015 http://www.safetyandrights.org/publications/annual-report/nsr-2015.html
6) Bangladesh Labour Act, 2006 and Bangladesh Labour Rules 2015, Chapter: 5, 6, 7 and 8.
7) ITCILO learning resources, http://campuslife.itcilo.org/learning-resources

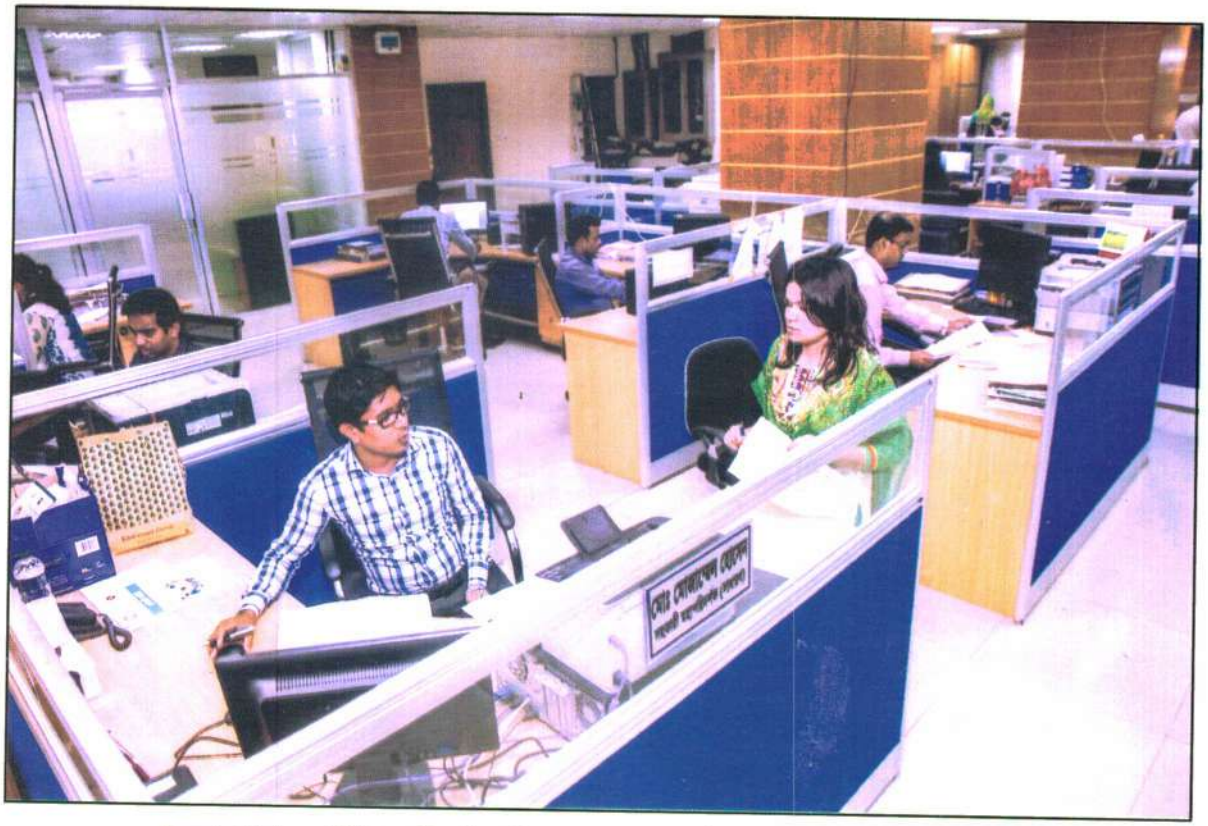

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ

বাংলাদেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংস্কৃতি গড়ে তোলার সম্ভাবনা : সম্ভাব্য প্রতিকুলতা ও সমাধান

এ আর চৌধুরী রিপন
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ অক্যুপেশনাল সেইফটি
হেল্‌থ এন্ড এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন (ওশি)

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের অন্যতম অধিকার। এ অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকার, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সম্মিলিত প্রয়াস জরুরি। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে এ বিষয়ে যত আলোচনা হয়েছে, কর্মক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ততোটা দৃশ্যমান হয় নি। ২০১৬ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে পেশাগত দুর্ঘটনায় ১,২৪০ জন শ্রমিকের প্রাণহানির ঘটনা অনিরাপদ কর্মক্ষেত্রের চিত্র প্রমাণ করে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার হিসেব অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা অথবা পেশাগত রোগের কারণে বিশ্বব্যাপী প্রতি ১৫ সেকেন্ডে ১ জন শ্রমিক মারা যায়। একই কারণে প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করে ৬,৩০০ জন এবং বছরব্যাপী এ ধরনের মৃত্যুর সংখ্যা ২৩ লক্ষ। অথচ কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হলে এবং পেশাগত রোগের প্রতিরোধ বা প্রতিকারের উপায় গ্রহণ করা হলে এ ধরনের অনাকাঙ্খিত মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করা যায়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বলা যায়, এখানে ট্রেড ইউনিয়নকে সম্পৃক্ত করে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংস্কৃতি এখনো বিকশিত হয় নি। এ অবস্থার জন্য দায়ী হচ্ছে শিল্প কলকারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমকে নিরুৎসাহিত করা এবং অধিকাংশ কর্মক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন না থাকা।

ট্রেড ইউনিয়ন কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরুপণ, ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য অবহিতকরণ, ইউনিয়ন সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন, মূল্যায়ন ও ফলোআপ এবং সর্বোপরি একটি সেইফটি সংস্কৃতির বিকাশে অবদান রাখতে পারে।

যেহেতু ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের খুব কাছাকাছি থেকে কাজ করে, তাই কর্মক্ষেত্রের সার্বিক নিরাপত্তা অবস্থা নিকট থেকে দেখার সুযোগ হয়। কোন শ্রমিক যখন কর্মক্ষেত্রে অনিরাপদ থাকেন বা ঝুঁকি নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তখন তিনি অনায়াসেই সে সমস্যা সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়নকে অবহিত করতে পারেন, যা ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ মালিকপক্ষ বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। এভাবে শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্কের মাধ্যমে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র গড়ে তোলা যায়। সেজন্য শিল্প মালিকদেরকে শ্রমিক সংগঠনের সাথে বিদ্যমান 'কম্যুনিকশেন গ্যাপ' হ্রাস করতে এগিয়ে আসতে হবে এবং শ্রমিক, মালিক, সরকারসহ অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে সামাজিক সংলাপ চালু রাখতে হবে।

কর্মক্ষেত্রে অনিরাপদ পরিস্থিতি কোন শ্রমিকের ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, তাই বিষয়টিকে সামষ্টিক হিসেবে দেখতে হবে এবং সামষ্টিক বিবেচনায় এর সমাধানও বের করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে যত বেশী জ্ঞানসম্পন্ন হবেন, নিরাপদ কর্মক্ষেত্রের জন্য তারা তত বেশি অবদান রাখতে পারবেন।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন, বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বিধিমালা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালার আলোকে ট্রেড ইউনিয়নকে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পেশাগত রোগ প্রতিরোধে কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ দেয়া জরুরি।

প্রতি বছর ২৮ এপ্রিল জাতীয় পেশাগত নিরাপত্তা ও সেইফটি দিবস উদযাপনে সরকারি সিদ্ধান্ত এ সেক্টরের অংশীজনদের দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করছে। প্রতিটি কর্মস্থলে কার্যকর ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং নিয়মমাফিক কার্যক্রম চালানোর ক্ষেত্রে সরকার ও মালিকপক্ষের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও সহযোগিতা গণতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনকে যেমন জোরদার করবে তেমনি কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সেইফটি সংস্কৃতিকে আরো বিকশিত করবে। ট্রেড ইউনিয়ন কৌশলগতভাবে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র ও সেইফটি সংস্কৃতি বিকাশে অবদান রাখতে পারে, সেক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের কতিপয় করণীয় নীচে উল্লেখ করা হলো:

১। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা, কর্মক্ষেত্রে সেইফটি ঝুঁকি নিরূপন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়া এবং এ বিষয়ে শ্রমিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়মিতভাবে অবহিতকরণ।

২। ট্রেড ইউনিয়নের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি অর্ন্তভুক্ত করা এবং প্রশিক্ষিত কর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ফলো আপ কর্মসূচী আয়োজন করা।

৩। শ্রম আইন ও বিধিমালা মোতাবেক কর্মস্থলসমূহে সেইফটি কমিটি গঠনের সময় ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৪। মালিকপক্ষ বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ পেশাগত নিরাপত্তা বিষয়ে যেসব প্রশিক্ষণ আয়োজন করেন, সেখানে প্রশিক্ষিত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের 'প্রশিক্ষক' হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করা।

৫। কর্মস্থলে ট্রেড ইউনিয়নকে প্রতিপক্ষ বিবেচনা না করে উৎপাদন সহায়ক সামাজিক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা।

৬। পেশাগত নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ট্রেড ইউনিয়নের আর্থিক সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনা করা।

যশোরে শ্রমিকগণের সঙ্গে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মত বিনিময়

Accident causation and prevention

Bulbul Ahmed
Deputy Inspector General
Tangail

Introduction: Accident in workplace is a common affair in industrialization. Occupational accident always hampers the lives and resources. Prevention of occupational accident is safe investment and good employment relation.

Definition: Accident is an event that results in injury health to a worker or member of public along with resources of workplace.

The causes of occupational accident: Researchers from different fields of science and engineering have been trying to develop a theory of accident causation which will help to identify, isolate and ultimately remove the factors that contribute to or cause accidents. Some of the most common theories are:

The Domino Theory: According to W. H. Heinrich (1931), who developed the so- called domino theory, 88 percent of all accidents are caused by unsafe acts of people, ten percent by unsafe conditions and two percent by acts of god. He proposed a five factor accident sequence. The sequence of accident factors is as follows: Ancestry and social environment, Worker fault, Unsafe act together with mechanical and physical hazard, accident and damage or injury.

Theory of Multiple Causation: It postulates that a single accident is not caused by one unsafe act or condition, but rather by many contributory factors, causes and sub- causes, and that certain combinations of these give rise to accidents. According to this theory, the contributory factors can be grouped into the following two categories-

Behavioral: This category includes factors pertaining to the worker, such as improper attitude, lack of knowledge, lack of skills, and inadequate physical and mental conditions.

Environmental: This category includes improper guarding of other hazardous work elements and degradation of equipment through use and unsafe procedures.

Iceberg theory of Accident: Although it is not a purely accident causation theory, its study is important. According to this theory there is a proportion and relationship among the number of fatal accident, accidents with minor injuries, incidents and near misses that take place in an enterprise. Potential of an occurrence to become a near miss, or an incident, or an accident with injuries is just probabilistic.

Main factors that contributed to causing the accident: Accident causes are often classified as either-

Direct /immediate: Lack of marching guarding, failure to follow instructions lack of maintenance.

Indirect /root: Poor building machine layout excessive time pressures. Failure windily safe system of work, failure to ensure safe systems of work are follows considering the issues above all the main factor, that contributed to causing accident in workplace are bellow –

Organizational: Analyzing the information will reveal many types of circumstance that can be the organizational factors to the causing occupational accident-

(1) Work pressure and long hours.

(2) Availability of sufficient resource.

(3) Quality of supervision.

(4) Management belief is health and safely (Safety Culture).

Physical Factors: In this cause the physical factors causing such kinds of accident are exist in to two stasis

The workplace: The issues cover the work place are housekeeping, lighting, Noise, Layout,

(1) The Equipment: The equipment related factor in this cases study are easiness of to interpret t, controls, error detection or prevention of equipment disguised the guarding standards are not suitable.

The main factors that contributed to causing the accident in case study-1: The accident occurred when a steal Erector foreman electrocuted by an overhead power line. The main factors contributing this accident are-

Organizational: The organizational factor that causes the accident is the management beliefs is health and safety is known and the safety culture. Because the time of the project was only 4 hour. The experience of the workers is 4 months only. The workers had no OSH training. No physical barriers work to prevent this touch of boom from power. So the management safety culture is the factor that occurs the accident. There also another organizational factor causing this accident is quality of supervision as the victim is supervised by himself.

Physical: The equipment the victim worker work with is a long boom. The boom was long enough to touch an overhead power line. The long boomed was not easy to interpret the control. So the equipment booms the physical factor that causing the accident.

Human factor: The factors are responsible for causing this accident human factor is of those. The main human factor here is the workers knowledge's skill and experience is undertaking the task involved. The workers were is the process of moving of a steel canopy structure using a crane with a long boom. It seems an expertise duty. But the workers had only 4 monthly of experience in relevant field. He has no OSH training also.

Organizational: The organizational factor that contributed to causing the accident is the safety culture of management. Because the victim workers had not given OSH training. The safety measures was taken by them is not sufficient. The workers were working in trench had no scope to climb up directly.

Physical: The physical factor exist is cussing the accident in the trench is workplace layout. The employers were laying sewer pipe in a trench were not shored or protected to prevent a cave- in. Soil in the lower portion of the trench was mostly sand and gravel and the upper portion was clay and loam. There was no protection from vibration. So the wrong layout of workplace can contribute the accident.

Human factor: The sizes of work crew in the sites are 4. The employees victim to accident in the trench were not experienced workers. They had only 9 month's experiences and had not OSH training also. The human factor contributed to causing the accident here is the competence of workers works as knowledge skill and experience is undertaking the task involved. On the others hand another human factor involved here is behavioral issues like rule and knowledge based mistakes. When one labor falls into victim other worker went to his co-worker"s aid and accident occurred.

Preventive measures: There are some preventive measures might be appropriate to prevent the recurrence of this or similar accident.

(1)The organizational, physical and human factor that contributed to causing the accident should be controlled administration and technically and other ways.

(2) Qualify of supervision should be ensured.

(3) Availability of sufficient resources should be ensured.

(4) Ensure the proper using of personal protection equipment.

(5) The lay out, houses keeping and equipment of sites must be safe in use.

(6) Hazards identification and risk assessment involved in.

(7) Because of the complex factors involved in accidents they need to be investigated properly.

(8) The aim is the prevention of next accident not punishment or allocation of blame for the cannot one.

(9) Immediate investigation of accident and reporting to the management.

Conclusion: Accident causation and prevention is a vulnerable issue for compliance. To ensure better workplace, stakeholders need to be preventive causing accident.

DIFE-The Light of Hope

Sikder Mohammad Tawhidul Hasan
Assistant Inspector General (Safety)
(Staff Officer to IG)
DIFE, HQ

The time what brought us all together. The moment which compelled us to witness the unbearable grief. The event which made us standstill. The silence which was frequently broken by the wailing.Amidst all the despair and darkness it was always believed that there was a distinct light at the end of the tunnel which will bring the sheer luminosity and lighten up to unveil the hope. Here comes DIFE, the light of hope, the savior.

Let's take a look back. Following the Rana plaza collapse back in 2013, accepting all the challenges with a new hope, with a new vision, the inspectorate was upgraded from directorate to department in 15th January, 2014. Worth-mentioning that a battle without warriors is nothing. Aligning with this,good number of inspectors with indomitable spirit prepared to take all the challenges. As of now, there are 310 inspectors working in DIFE.

There is an adage "The good of the people is the greatest law". The Bangladesh Labour Act, 2006 has been amended on 16th July 2013 focusing on workers' safety, welfare and rights and promoting trade unionism and collective bargaining.The Bangladesh Labour rules has been published and promulgated on 15th September, 2015. National Occupational Safety and Health Policy 2013 has also been adopted.

Since Inspection is the top-notch priority to get to know whether the factories are well equipped with safety measures and are being maintained in accordance with the Bangladesh Labour Law and Bangladesh Labour Rules. Inspection activities are being rigorously done by DIFE Labour Inspectors with full commitment.

What is right is often forgotten by what is convenient. Keeping in mind "Absolute zero tolerance", ensuring safety in the workplace is the highest priority. Total no of 3780 no of RMG factories have been assessed where 1549 no of factories have been assessed by National Initiative with the assistance of ILO, 1505 by Accord and 890 by Alliance.Remediation Coordination Cell has been established and remediation activities on the verge of kicking off. Hopefully it will bring a new dimension.

With the help of GIZ, a HELP LINE has been launched on 15th March, 2015 which is a Toll Free Number. Helpline is in operation on a pilot basis in Ashulia.Apart from Helpline, there are complain boxes in 23 Deputy Inspector General Offices including HQ. General public can put their complains to those complain boxes.

Digitalization brings next big idea. Digitalization brings transformation. With the magical touch of information technology, Labour Inspection Management Application (LIMA) has been developed with a comprehensive factory inspection checklist integrated in to the application for more transparency and smooth inspection. It also give us a scope to generate online report. DIFE website has already been connected to National Portal (www.dife.gov.bd). Online factory license is already in operation. A RMG database comprises 2860 no of RMG factories is already on live. A full-fledged database for all types of industries around the country will be under development.

Abraham Lincoln said "The best way to predict future is to create it". DIFE has a dream to establish an "National academy for Occupational Health and Safety"- the one and only OSH research institution, the very first of its kinds in Bangladesh.

Last but not the least, DIFE is on the right track under the leadership of Honorable Inspector General. We are exactly where we need to be. Believe that DIFE has the best resources what our country has to offer to make a great deal of difference.

DIFE inspector is inspecting at the Factory.

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপনের কিছু উল্লেখযোগ্য মূহুর্ত

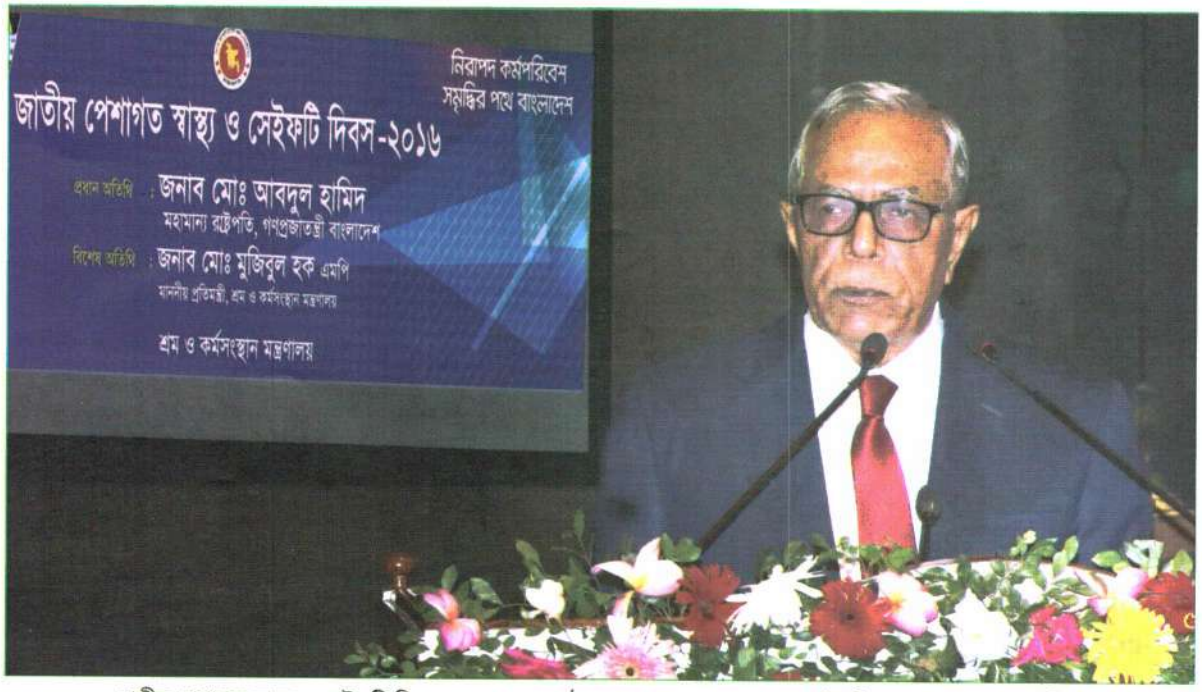

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৬ এর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৬ এর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৬
উদ্‌যাপনের কিছু উল্লেখযোগ্য মূহুর্ত

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৬ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ (মাঝে) ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৬ এর অনুষ্ঠানে উপস্থিত নারী শ্রমিকদের একাংশ

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপনের কিছু উল্লেখযোগ্য মূহুর্ত

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৬ এর অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রমিক নেতৃবৃন্দের একাংশ

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৬ তে অনুষ্ঠানে বৈদেশিক অংশীজনের অংশগ্রহণ

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপনের কিছু উল্লেখযোগ্য মূহুর্ত

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৬ এর র‍্যালী প্রস্তুতিপূর্ব (বা থেকে) বর্তমান মহাপরিদর্শক জনাব মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া ও সাবেক মহাপরিদর্শক জনাব সৈয়দ আহম্মদ

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৬ এর র‍্যালীর নেতৃত্বে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু চিত্র

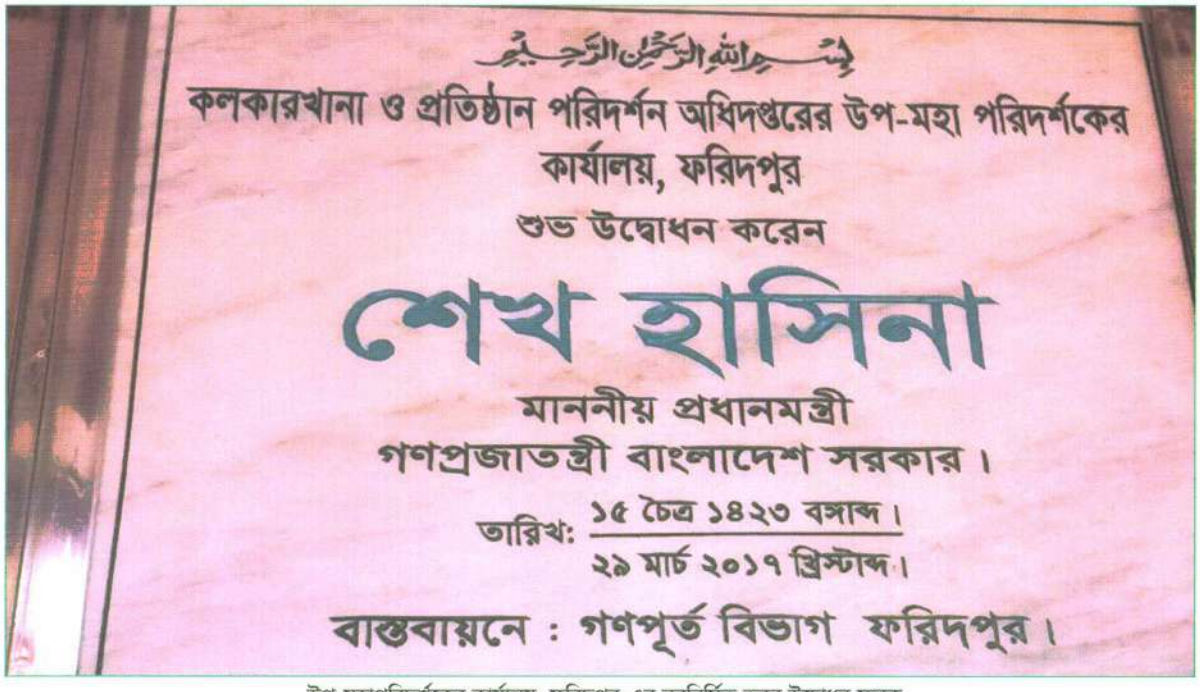

উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ফরিদপুর-এর নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন ফলক

উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, গাজীপুর-এর নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু চিত্র

উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, গাজীপুর-এর নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠান

উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ফরিদপুর-এর নবনির্মিত ভবনে সচিব মহোদয়কে স্বাগত জানাচ্ছেন মহাপরিদর্শক

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু চিত্র

উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কুষ্টিয়া-এর নবনির্মিত ভবনের ফলক উন্মোচন করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কুষ্টিয়া-এর নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠান

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু চিত্র

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সাথে চলমান প্রকল্প নিয়ে আলোচনারত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত

জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল-এর সভায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী দিকনির্দেশনা প্রদান করছেন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু চিত্র

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব, শ্রম কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অধিদপ্তরের কাজে গতিশীলতা আনার জন্য মহাপরিদর্শককে (সাবেক) গাড়ির চাবি হস্তান্তর করছেন

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ বাস্তবায়ন বিষয়ক আলোচনা সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু চিত্র

অংশীজনবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক (সাবেক)

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রচারণা কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠান

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু চিত্র

সেফটি কমিটি'র সদস্যদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন

কারখানা পরিদর্শন চেকলিস্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু চিত্র

দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকের চিকিৎসার্থে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল হতে মহাপরিদর্শক (সাবেক) কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান

শ্রম পরিদর্শন বিষয়ক কৌশলগত পর্যালোচনা কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মহাপরিদর্শক (সাবেক)

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু চিত্র

LIMA বিষয়ক মাঠ পরীক্ষা সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন সেশন

মৌলভীবাজারে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে মহাপরিদর্শক

নিরাপদ কর্মপরিবেশ
এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

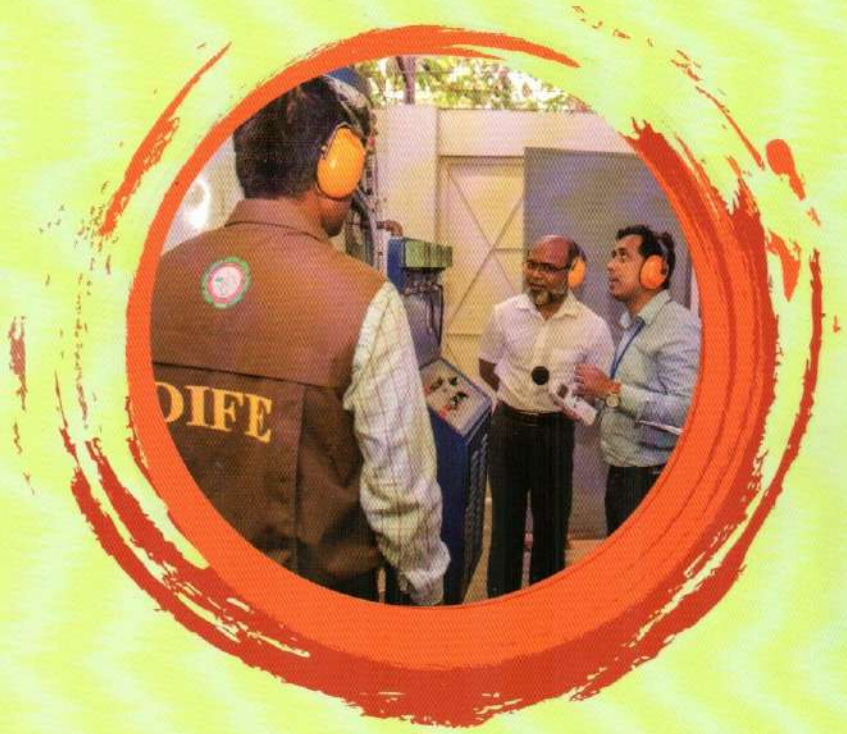

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সবার আগে
সবার সাথে

Canada

Kingdom of the Netherlands

UKaid

International Labour Organization